তফসীরে

মা'আরেফুল-কোরআন

প্রথম খণ্ড

[সূরা ফাতিহা থেকে সূরা বাক্বারা পর্যন্ত]

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' (র)

অনুবাদ

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ওহীর তাৎপর্য	১
ওহী নাযিল হওয়ার পদ্ধতি	৪
কোরআন নাযিলের ইতিহাস	৬
সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত	৭
মক্কী ও মদনী আয়াত	৭
শানে নযুল প্রসঙ্গে	১২
সাত হরফ বা সাত ক্বেরাআত প্রসঙ্গ	১৩
সাত ক্বারী	১৮
কোরআন সংরক্ষণের ইতিহাস	২০
ওহী লিপিবদ্ধকরণ	২২
তেলাওয়াত সহজ করার প্রচেষ্টা	৩০
নোক্‌তা	৩০
হরকত	৩১
মন্‌যিল	৩১
কয়েকটি যতি-চিহ্ন	৩৩
ইলমে তফসীর	৩৫
ইসরাঈলী বর্ণনা সম্পর্কে নির্দেশ	৩৯
তফসীর সম্পর্কে ভুল ধারণার অপনোদন	৪০
কতিপয় প্রসিদ্ধ তফসীর	৪৩
তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন প্রসঙ্গে	৪৭
সূরা আল-ফাতিহা	৫৩
বিস্‌মিল্লাহর তফসীর	৫৭
সূরাতুল-ফাতিহার বিষয়বস্তু	৬২
মালিক কে?	৭০
সরল পথ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা	৮০
সূরা আল-বাক্বারাহ্	৯৩
হরূফে মুকাত্তা'আত	৯৭
খতমে নবুওয়ত সম্পর্কিত মাসআলার একটি দলীল	১০৫
কুফর ও ঈমানের সংজ্ঞা	১২৩
নবী এবং ওলীগণের প্রতি দুর্ব্যবহারের পরিণাম	১২৫
তাওহীদের বিশ্বাসই দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তার জামিন	১৩৭
কোরআন একটি স্থায়ী মু'জিযা	১৪৩
কিছু সন্দেহ ও তার জবাব	১৬৩
মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের মধ্যবর্তী সময়	১৮০
জগতের প্রত্যেক বস্তুই মানবের উপকারার্থ সৃষ্ট	১৮১
আদম সৃষ্টি প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের সাথে আলোচনার তাৎপর্য	১৮৬
ভাষা স্রষ্টা আল্লাহ্ পাক স্বয়ং	১৯১
পৃথিবীর খেলাফত	১৯২
পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামী শূরা	১৯৭
সিজদার নির্দেশ	১৯৮
সম্মান প্রদর্শনার্থ সিজদা	১৯৯
নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া	২০৮
আদম (আ)-এর পৃথিবীতে অবতরণ কি শাস্তি?	২১৬
মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের বিশেষ মর্যাদা	২২৩
কোরআন শিখিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয	২২৪
ঈসালে-সওয়াব উপলক্ষে খতমে কোরআনের বিনিময় গ্রহণ	২২৫
খলীফা সুলায়মানের দরবারে হযরত আবু হাযেম (র)-এর উপস্থিতির ঘটনা	২২৫
নামাযের জামাত সম্পর্কিত নির্দেশাবলী	২৩৪
আমলহীন উপদেশ প্রদানকারীর নিন্দা	২৩৬

দু'টি মানসিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার	২৩৭	ইজমা শরীয়তের দলীল	৪১০
খুশু বা বিনয়	২৩৯	কা'বা শরীফ ও কেবলা	৪১২
ধর্মীয় কাজে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ	২৬৭	সুন্নাহকে কোরআনের দ্বারা	
আকৃতি রূপান্তরের ঘটনা	২৬৭	রহিতকরণ	৪১৩
অনন্তকাল দোযখবাস	২৭৯	নামাযে লাউডস্পীকার ব্যবহারের	
হযরত সুলায়মান ও যাদু	৩০০	মাসআলা	৪১৫
যাদু ও মো'জেযার পার্থক্য	৩০৬	কেবলার দিক জানা সম্পর্কে	৪২০
শরীয়তে যাদু সম্পর্কিত বিধি-বিধান	৩০৮	দ্বীনি ব্যাপারে অর্থহীন বিতর্ক	৪২৯
আল্লাহ্‌র বিধানে নসখের স্বরূপ	৩১৩	সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নামায পড়া	৪৩০
বংশমর্যাদা বনাম ঈমান	৩২২	যিকিরের তাৎপর্য	৪৩৩
হযরত খলীলুল্লাহ্‌র পরীক্ষাসমূহ	৩৪১	ধৈর্য ও নামায যাবতীয় সংকটের	
হযরত খলীলুল্লাহ্‌র মক্কায় হিজরত		প্রতিকার	৪৩৪
ও কা'বা নির্মাণের ঘটনা	৩৫০	আলমে-বরযখে নবী এবং শহীদগণের	
হেরেম সম্পর্কিত বিধি-বিধান	৩৫৪	হায়াত	৪৩৮
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া	৩৫৯	বিপদে ধৈর্য ধারণ	৪৪০
রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্মের বৈশিষ্ট্য	৩৬৬	দ্বীনের ইলম প্রচার করা ওয়াজিব	৪৪৫
পয়গম্বর প্রেরণের উদ্দেশ্য	৩৬৭	রসূলের হাদীস ও কোরআনের হুকুম	৪৪৭
অর্থ না বুঝে কোরআনের শব্দ পাঠ		লা'নত প্রসঙ্গ	৪৪৭
করা	৩৬৮	তওহীদের মর্মার্থ	৪৫০
হেদায়েত ও সংশোধনের দু'টি ধারা	৩৭১	অন্ধ অনুকরণ বনাম তকলীদ	৪৫৮
সংশোধনের নিমিত্ত চারিত্রিক		হালাল ও হারামের ফলাফল	৪৬১
প্রশিক্ষণ জরুরী	৩৭৪	মৃত জানোয়ার সম্পর্কিত মাসআলা	৪৬২
ধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষাদান	৩৮৫	রুগীর গায়ে অন্যের রক্ত দেওয়ার	
বাপ-দাদার কৃতকর্মের ফলাফল		মাসআলা	৪৬৫
সন্তানরা ভোগ করবে না	৩৮৭	শূকর হারাম হওয়ার বিবরণ	৪৬৭
ঈমানের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ ব্যাখ্যা	৩৯১	আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে	
ফেরেশতা ও রসূলের প্রতি ভালবাসায়		যা যবেহ্ করা হয়	৪৬৭
ভারসাম্য	৩৯২	আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে মানত	
দ্বীন ও ঈমানের এক সুগভীর নমুনা	৩৯৩	সম্পর্কিত মাসআলা	৪৭১
ইখলাসের তাৎপর্য	৩৯৫	নিরুপায় অবস্থার বিধি-বিধান	৪৭১
কেবলার বিবরণ	৪০০	ঔষধ হিসাবে হারাম বস্তুর ব্যবহার	৪৭২
মধ্যপন্থা ও মুসলিম সমাজ	৪০৩	ধর্মকে বিক্রি করার শাস্তি	৪৭৫
সাক্ষ্যদানের জন্য ন্যায়ানুগ		কিসাস বা হত্যার শাস্তি	৪৮৪
হওয়া শর্ত	৪১০	ওসীয়ত	৪৮৯

রোযার হুকুম	৪৯২	ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা	৬০৭
রোযার ফিদ্‌ইয়া	৪৯৫	নারী ও পুরুষের মর্যাদার পার্থক্য	৬১১
পঞ্চম হুকুম–ই'তিকাফ	৫০৪	শরীয়তের দৃষ্টিতে বিয়ে ও তালাক	৬১৫
সেহরীর সময়সীমা	৫০৫	একত্রে তিন তালাকের প্রশ্ন	৬২২
ইসলামী বিধানই বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে	৫১০	তালাকের উত্তম পন্থা	৬৩৪
হালাল সম্পদের বরকত এবং হারামের অপকারিতা	৫১৪	আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে কোরআনের অনুপম দার্শনিক নীতি	৬৩৭
শরীয়তের দৃষ্টিতে চান্দ্র ও সৌর হিসাবের গুরুত্ব	৫২১	শিশুকে স্তন্যদান ও মায়ের ভরণ-পোষণ	৬৪১
জিহাদ বা ন্যায়ের সংগ্রাম	৫২৩	ইদ্দত সংক্রান্ত কিছু হুকুম	৬৪৬
জিহাদে অর্থ ব্যয়	৫২৭	স্ত্রীর মোহর	৬৪৮
হজ্জ ও ওমরাহ্	৫৩৩	মহামারীগ্রস্ত এলাকা সম্পর্কিত হুকুম	৬৫৭
সকল মানুষ একই মিল্লাতভুক্ত ছিল	৫৬১	তালুত ও জালুতের কাহিনী	৬৬৭
জিহাদ ফরয হওয়া সংক্রান্ত নির্দেশ	৫৭৪	আয়াতুল কুরসীর বিশেষ ফযীলত	৬৭৬
শরাব ও জুয়া সম্পর্কে	৫৮০	হযরত ইবরাহীম ও মৃতকে পুনর্জীবন দান	৬৮৭
এতীমের মাল	৫৯৭	আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়	৬৯৬
মুসলমান ও কাফিরের পারস্পরিক বিবাহ	৫৯৯	সুদ প্রসঙ্গ	৭১৩
তালাক ও ইদ্দত	৬০৫	ধার-কর্জের ক্ষেত্রে দলীল লেখার নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি	৭৪৯

অনুবাদকের আরয

সকল প্রজ্ঞার উৎস পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকেরই সমস্ত প্রশংসা। তিনিই অনুগ্রহ করে মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন। মানব জাতির হেদায়েতের জন্য পাক কালাম নাযিল করেছেন। তাঁর পবিত্র কালাম হৃদয়ঙ্গম করার মত বোধশক্তি দিয়েছেন। তাঁরই অনুগ্রহপ্রাপ্ত কিছু সংখ্যক সাধক মনীষী পাক কোরআন অনুধাবন এবং অন্যদের নিকট তা ব্যাখ্যা করার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এ সাধক জামাতের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে। হাদীস শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী মানবকুলের মধ্যে এরাই সর্বোত্তম এবং সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান লোক।

আল্লাহর পাক কালাম অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করার যে পদ্ধতি খোদ রসূল (সা) শিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং সাহাবায়ে-কিরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সত্যপন্থী সাধক আলিমগণ যে পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছেন, পরিভাষায় সেটিই 'ইল্‌মে-তাফসীর' নামে খ্যাত। তাই, তফসীর কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী-বিশেষের মস্তিষ্কপ্রসূত খেয়াল-খুশী নয়, অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র পরম্পরায় প্রাপ্ত দীনি ইলমের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকার। এ উত্তরাধিকারকে পাশ কাটিয়ে যাঁরা কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন, তাঁদের সে প্রচেষ্টাকে প্রতি যুগে উম্মতের জ্ঞানীগণ অনধিকার চর্চা এবং পরিত্যাজ্য বলে বিবেচনা করেছেন।

আরবী ভাষার প্রভাব-বলয় থেকে বহু দূরে অবস্থিত বাংলা ভাষাভাষী এলাকার লোকদের পক্ষে আল্লাহ্‌র কালাম অনুধাবন করার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তরজমা এবং তফসীর — উভয়েরই প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্র। দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমান-গণের তুলনামূলক হার অনুপাতে বাংলাভাষী মুসলমানের সংখ্যা বেশি। সেদিক থেকে বাংলায় পবিত্র কোরআনের তরজমা ও তফসীর এ পর্যন্ত খুব কমই হয়েছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরিগণ এ ক্ষেত্রে যে পরিমাণ সাধনার ঐতিহ্য রেখে গেছেন, তা নিতান্ত কম না হলেও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়।

কোরআন সর্ববিধ জ্ঞানের এমন এক অফুরন্ত উৎস, যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কিয়ামত পর্যন্ত শেষ হওয়ার নয়। কারণ, দুনিয়ার লয়কাল পর্যন্ত যত মানুষ আসবে, তাদের সবারই জীবন-পথের সর্বপ্রকার সমস্যার সঠিক সমাধান কোরআন পেশ করবে। এ কারণেই তফসীরের অনুসরণীয় ঐতিহ্য লক্ষ্য করে প্রতি যুগের জীবন জিজ্ঞাসার আলোকে কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার সাধনা অব্যাহত থাকবে। বলা বাহুল্য, এ সাধনা ধারার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বাংলা ভাষায় কোরআন পাকের তরজমা ও তফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্তই অপ্রতুল।

সুখের বিষয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সে অভাব দূর করার জরুরী প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করেই কতকগুলো প্রামাণ্য তফসীর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে পর বাংলা ভাষায় পাক-কোরআনের তফসীর-এর ক্ষেত্রে বিরাজিত অভাব অনেকটা দূর হবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের পরিকল্পনাধীন তফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে এ যুগের সর্বজন শ্রদ্ধেয় গবেষক আলিম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) সাহেবের আট খণ্ডে সমাপ্ত উর্দুতে রচিত 'তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন'-এর অনুবাদের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করা হয়।

আমার পক্ষে এ বিরাট তফসীর-গ্রন্থটি অনুবাদ করার দায়িত্ব গ্রহণ করা রীতিমত একটা দুঃসাহস ছাড়া আর কিছু নয়। এতদসত্ত্বেও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এ মহোত্তম পরিকল্পনার সাথে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে বাংলা ভাষায় প্রকাশিতব্য এ সর্ববৃহৎ তফসীর গ্রন্থের অনুবাদ কার্যে আত্মনিয়োগ করাকে আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যের বলে গ্রহণ করেছি। এ বিরাট কাজের পরিসমাপ্তি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল।

আধুনিককালের পাঠকগণের রুচির প্রতি লক্ষ্য রেখেই অনুবাদে সাধারণ চলতি ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তরজমা যথাসম্ভব সরল ও সহজবোধ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে অনুবাদ যাতে কোন অবস্থাতেই মূলের সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়ে না পড়ে সে ব্যাপারে যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে। গ্রন্থকার তাঁর পূর্বসূরী হযরত শাহ রফীউদ্দীন (র) ও শায়খুল-হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র)-এর অনুসরণে কোরআন শরীফের আয়াতগুলোর উর্দু অনুবাদ করছেন। উল্লেখ্য যে, এ উভয় বুযুর্গই আয়াতের আক্ষরিক অনুবাদ না করে মর্মানুবাদ করেছেন। তবে এতে মূলের সাথে তরজমা বিন্দুমাত্রও সামঞ্জস্যহীন হয়নি। বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রেও আমরা যত্নের সাথে সে ধারা অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি।

এ বিরাট গ্রন্থ যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তরজমার কাজ দ্রুততর করার লক্ষ্যে আমাকে আরো কয়েকজন বিজ্ঞ আলিমের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়েছে। যাঁরা আমাকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের মধ্যে জনাব মাওলানা আবদুল আযীয, মাওলানা সৈয়দ জহীরুল হক, মাওলানা আবদুল মান্নান এবং অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়ার নাম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হয়। আল্লাহ পাক তাঁদের যোগ্য প্রতিফল দান করুন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব আ. জ. ম. শামসুল আলম, সেক্রেটারী জনাব সাদেকউদ্দীন, প্রশাসক জনাব মেজর এরফান উদ্দীন, প্রকাশনা বিভাগের হাফেজ মাওলানা মঈনুল ইসলাম এবং মাওলানা আবুল খায়ের আহমদ আলীর অফুরন্ত প্রেরণা ও সহযোগিতা এ মহাগ্রন্থ দ্রুত প্রকাশনার ব্যাপারে কতটুকু

কাজ করেছে, তা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়। আল্লাহ্ পাক এঁদের প্রত্যেককেই তাঁর কালামের এ খিদমতের যোগ্য প্রতিদান দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে প্রদান করুন—এ দোয়া ছাড়া আমার পক্ষে করবার মত আর কিছু নেই।

রাব্বুল আলামীন! তুমি আমাদের সকলেরই অন্তরের খবর রাখ। যাকে ইচ্ছা তুমি তোমার দীনের বিভিন্নমুখী জিহাদে নিয়োজিত কর। তোমার তওফীক ছাড়া তোমার কালাম বোঝা এবং অন্যকে বোঝানোর সাধ্য কারো নেই। তুমি দয়া করে আমাদের সকলের এ শ্রম-সাধনা কবূল কর! এর উসিলায় আমাদের সকলের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন কল্যাণময় কর!

মাওলা! আমি পাপী, এই ছিয়াহ্কারকে তুমিই দয়া করে এ কাজে নিয়োজিত করেছ। এ মহতি কাজের সুসমাপ্তি তোমারই তওফীকের উপর নির্ভর করে। দয়া করে তুমি কবূল কর! আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

বিনীত

মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা, ঢাকা

শা'বান, ১৪০০ হিজরী

লেখক পরিচিতি

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত তফসীরগ্রন্থসমূহের মধ্যে 'মা'আরেফুল কোরআন' সর্ব বৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠরূপে স্বীকৃত। এ অসাধারণ গ্রন্থটিতে তফসীর শাস্ত্রের মূল উৎস থেকে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাদির উদ্ধৃতি ও পর্যালোচনার পাশাপাশি আধুনিক কালের নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জবাবও এমন চমৎকার যুক্তি ও মনীষাঋদ্ধভাবে দেওয়া হয়েছে, যা প্রচলিত অন্য কোন তফসীরগ্রন্থে তালাশ করা অর্থহীন। হাদীস, ফিকহ্, তাসাউফসহ দীনি ইলমের সবগুলো শাখায় একটা অসাধারণ ব্যুৎপত্তির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর যেন 'মা'আরেফুল কোরআনে'র প্রতিটি পাতায় সমভাবে ছড়িয়ে রয়েছে।

প্রায় সাত হাজার পৃষ্ঠার এ অনন্য তফসীর গ্রন্থটির আর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, পবিত্র কোরআনের মর্মকথা যেন এর দ্বারা সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিকটই সমভাবে বোধগম্য করে দেওয়া হয়েছে। মনে হয়, যেন এ যুগের অস্থিরচিত্ত পথহারা মানুষগুলোকে পবিত্র কোরআনের কাওসার-সুধা পান করিয়ে চিরশান্তি ও কল্যাণের পথে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যেই পরওয়ারদেগার তাঁর এক সাধক বান্দার হৃদয়-মন উদ্বেলিত করে তুলেছিলেন মা'আরেফুল কোরআনের ন্যায় একটি অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করার আকুতিতে।

এ অনবদ্য তফসীর গ্রন্থটির লেখক হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) (জ. ১৮৯৭ খৃ.; মৃ. ১৯৭৬ খৃ.) মা'আরেফুল কোরআনের ভূমিকা অংশে তিনি স্বীয় পরিচিতি পেশ করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

> বান্দা মুহম্মদ শফী ইবনে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াছীন (র) এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবে না যে, মহান আল্লাহ্ পাক দীনি ইলমের কেন্দ্রভূমি দেওবন্দকে তাঁর জন্মভূমি রূপে নির্বাচিত করেছেন। এতদসঙ্গে এমন এক মহান পিতার কোলে তাঁর লালন-পালন হয়েছে, যিনি ছিলেন হাফেজে কোরআন ও আলেমে দীন। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাকালেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। ফলে সেখানকার উলামায়ে হাক্কানীর নিকট-সান্নিধ্যে উপকৃত হওয়ার অবারিত সুযোগ তিনি লাভ করতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন দারুল উলূমের প্রাথমিক যুগের মহান বুযুর্গগণের একজন জীবন্ত স্মৃতি। জন্ম থেকে মৃত্যু কাল পর্যন্ত দারুল উলূমের পরিবেশেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে। এখানেই লেখাপড়া করেছেন এবং এ প্রতিষ্ঠানেই তালীমের খেদমতে জীবন কাটিয়ে গেছেন।

ওয়ালেদ সাহেবের ইচ্ছাতেই আমি অধমের শিক্ষাজীবনের সূচনা হয় দারুল উলূমের হেফজ বিভাগে জনাব হাফেজ আবদুল আজীম ও জনাব হাফেজ নামদার খান (র)-এর তত্ত্বাবধানে। অতঃপর ওয়ালেদ মুহতারিমের নিকট উর্দু, ফারসী, অংক, জ্যামিতি এবং আরবী ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। অতঃপর ১৩৩১ হিজরীতে দারুল উলূমে নিয়মিত ভর্তি হয়ে ১৩৩৫ সন পর্যন্ত দরসে- নেজামীর সমগ্র পাঠ্যসূচী এমন সব দক্ষ উস্তাদের নিকট সমাপ্ত করার সৌভাগ্য হয়, যাঁদের তুল্য বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের উস্তাদ বর্তমানে দুনিয়ার যে কোন অঞ্চলে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

শিশুকাল থেকে শুরু করে মাধ্যমিক পর্যায়ের আরবী জামাতে পড়ার সময় পর্যন্ত আরব আজমের সর্বজনশ্রদ্ধেয় বুযুর্গ উস্তাদ শায়খুল-হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র)-এর খেদমতে হাযির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। কোন কোন সময় তাঁর বুখারী শরীফের দরসে বসে বরকত হাসিল করারও সুযোগ লাভ করেছি। মাল্টার বন্দী জীবন থেকে ফিরে আসার পর তাঁর পবিত্র হাতেই সর্বপ্রথম বায়'আত হওয়ারও ভাগ্য হয়। আরবী ইলমের বিভিন্ন বিষয় যে সব যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গের নিকট শিক্ষালাভ করার সুযোগ হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ঃ হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (র), আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা মুফতী আজীজুর রহমান, আলেমে রব্বানী হযরত মাওলানা আসগর হোসাইন সাহেব (র), শায়খুল ইসলাম হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র), শায়খুল আদব ওয়াল ফিক্হ হযরত মাওলানা এজাব আলী সাহেব (র)। এ ছাড়াও ছিলেন হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইবরাহীম ও হযরত আল্লামা রসূল খান সাহেব (র)।

দারুল উলূমের মহান উস্তাদগণের স্নেহদৃষ্টি প্রথম থেকেই এ অধমের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। ১৩৩৬ হিজরী সনে উচ্চতর কয়েকটি বিষয়ের কিতাব পড়া অবস্থাতেই মুরুব্বীগণ দারুল উলুমের দু'একটা করে সবক পড়াতে নির্দেশ দেন। পরবর্তী বছর (১৩৩৭ হি.) থেকেই নিয়মিত একজন শিক্ষক রূপে নিয়োজিত হই। দীর্ঘ বারো বছর ধরে মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চতর জামা'আত পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয় পড়ানোর দায়িত্ব পালন করতে হয়। হিজরী ১৩৪৯ সনে আমাকে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এতদসঙ্গে উচ্চতর পর্যায়ে হাদীস এবং তফসীরের দু'একটা কিতাব পড়ানোর দায়িত্বও পালন করতে হয়। অবশেষে ১৩৬২ হিজরীতে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এবং আনুষঙ্গিক আরও কিছু কারণে দারুল উলূমের সকল দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করতে হয়। দারুল উলূমে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছরের শিক্ষকতা ও ফাতওয়া দানের খেদমতে নিয়োজিত থাকার সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কিছু কিছু লেখার কাজও শুরু হয়েছিল। মুজাদ্দিদে মিল্লাত হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী

থানবী (র)-র খেদমতে যাতায়াত শিক্ষাজীবন থেকেই শুরু হয়েছিল। তবে ১৩৪৬ হিজরীতে তাঁর পবিত্র হাতে বায়'আত নবায়নের পর থেকে ১৩৬২ হিজরীর রজব মাসে অর্থাৎ হযরতের ওফাত কাল পর্যন্ত দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত নিয়মিত যাতায়াত মাঝে মাঝে খেদমতে অবস্থানেরও সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।

হযরত থানবী (র)- কে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রকার ইলমে পূর্ণতা দান করেছিলেন। তফসীর এবং তাসাউফ ছিল তাঁর সর্বাধিক প্রিয় বিষয়। তফসীরে বয়ানুল কোরআন এবং তাসাউফ বিষয়ক তাঁর রচনা 'আত্-তাকাল্লুফ' এবং 'আত্-তামাররুফ' প্রভৃতি কয়েকটা মূল্যবান পুস্তক-পুস্তিকা এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শেষ জীবনে হযরত থানবী (র) পবিত্র কোরআনের আলোকে আধুনিক সমস্যাদির সমাধান সম্পর্কিত একখানা পরিপূর্ণ গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কাজটি দ্রুত সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যেই কয়েকজনের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে দেওয়া হয়। এর এক অংশের দায়িত্ব আমার উপরও অর্পণ করা হয়েছিল। আরবী ভাষায় রচিত এ মূল্যবান গ্রন্থটি 'আহকামুল কোরআন' নামে প্রকাশিত হয়েছে। আমার উপর ন্যস্ত অংশটুকুর অধিকাংশই হযরত থানবী (র)-র জীবিতকালেই সমাপ্ত হয়েছিল। অবশিষ্ট অংশটুকু পরে রচিত ও দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বলতে গেলে 'মা'আরেফুল কোরআন' রচনার ভিত্তিভূমি সেখান থেকেই রচিত হয়। কারণ হযরত থানবী (র)-র নিকট-সান্নিধ্যে অবস্থান করে পবিত্র কোরআন চর্চার যে রুচি এবং পদ্ধতি আয়ত্ত হয়েছিল, তারই আলোকে পরবর্তী পর্যায়ে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা সাধারণ মানুষের মধ্যে সহজ-সরল ভাষায় পরিবেশন করার আগ্রহ জন্মলাভ করে।

হিজরী ১৩৬৫ মোতাবেক ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের জন্য একটা স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার দাবি একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হওয়ার মুহূর্তে হযরত থানবী (র)-র জীবদ্দশায় প্রদত্ত ইঙ্গিত এবং বর্তমান মুরুব্বীগণের নির্দেশের আলোকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। এক পর্যায়ে জমিয়তে ওলামার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করতে হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমার উস্তাদ, মুরুব্বী ও ফুফাতো ভাই শায়খুল - ইসলাম হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র) ইসলামের আলোকে পাকিস্তানের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের একটি রূপরেখা তৈরীর প্রয়োজনে আমাকে জন্মভূমি দেওবন্দ ত্যাগ করে করাচী চলে আসতে নির্দেশ দেন। ফলে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে প্রিয় জন্মভূমি দেওবন্দ ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে আসি এবং কুদরতের ইশারাতেই সম্ভবত করাচীকে স্থায়ী বসবাসের স্থানরূপে গ্রহণ করতে হয়।

যে উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, উপমহাদেশের মুসলিম জনগণ যে মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তান অর্জনের জন্য নজিরবিহীন ত্যাগ

স্বীকার করেছিলেন, পরবর্তীতে অন্ধ স্বার্থ চিন্তা এবং আদর্শহীনতার কারণে সে স্বপ্ন একটা পরিপূর্ণ দুঃস্বপ্নে পরিণত হলেও ওলামায়ে-কিরাম মুসলিম জনগণের মধ্যে আদর্শ সচেতনতা অব্যাহত রাখার প্রয়াস কখনও ত্যাগ করেননি। একই উদ্দেশ্যে এই অধমও করাচীর আরামবাগ মসজিদে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক দরস শুরু করে। দীর্ঘ সাত বছর এ দরস সমাপ্ত হয়।

এরপর রেডিও পাকিস্তান থেকে 'মা'আরেফুল কোরআন' নামে একটা ধারাবাহিক কথিকা প্রচারের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়। কথিকাগুলি ছিল বিষয়ের ভিত্তিতে বাছাই করা কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা। আল্লাহ্‌র রহমতে ধারাবাহিক এ কথিকাগুলি এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে, এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থান এমনকি দেশের বাইরে বসবাসরত উর্দু ভাষাভাষীদের মধ্য থেকে ক্রমাগত পত্র আসতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মা'আরেফুল কোরআন' রচনা শুরু করতে হয়। ১৩৯০ হিজরী নাগাদ এর তেরোটি পারা লেখা সমাপ্ত হয়। এরপর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সূরা ইবরাহীম থেকে সূরা নহল পর্যন্ত দুটি পারার তফসীর সমাপ্ত হয়ে মূল কোরআনের অর্ধেক কাজ হয়ে যাওয়ায় হিম্মত অনেকটা বেড়ে গেল। কিন্তু সুদীর্ঘ রোগভোগ, বার্ধক্যের জড়তা এবং দেশের প্রতিকূল পরিবেশ উপেক্ষা করেই আল্লাহ্‌র অসীম রহমতে ১৩৯২ হিজরীর ২১ শাবান তারিখে 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' লেখার কাজ সমাপ্ত হলো। ঘটনাচক্রে এ তারিখটিতেই আমার জন্ম হয়েছিল এবং এ তারিখেই আমার বয়সের সাতাত্তরটা মনযিল পূর্ণ করে আটাত্তরের পথে যাত্রা শুরু করেছে।

উল্লেখ প্রয়োজন যে, রোগে-ক্লান্তিতে আসন্ন হয়ে গেলে আমার পরম স্নেহাস্পদ সন্তান মৌলভী তকী উসমানী 'মাআরেফ' লেখার কাজে আমাকে সাহায্য করেছে। অনেক সময় আমি বলে গিয়েছি, সে লিখেছে। আবার কখনও বা সে লিখে আমাকে শুনিয়েছে, আমি প্রয়োজনীয় সংশোধনীর পর তা পাণ্ডুলিপির সাথে শামিল করেছি। আল্লাহ্ পাক তার ইলম এবং ওমরে বরকত দান করুন।

'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' রচনা সমাপ্ত হওয়ার চার বছর পর ১৩৯৬ হিজরীর ৯ ও ১০ ই শওয়ালের মধ্যবর্তী রাত্রে হযরত মুফতী সাহেব দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। করাচীর চৌরঙ্গী এলাকায় প্রতিষ্ঠিত আলমে ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূমে লক্ষাধিক লোক তাঁর জানাযা ও দাফন-কাফনে শরীক হয়। জানাযা পড়ান হযরত থানবী (র)-র অন্যতম খলীফা আরেফ বিল্লাহ ডাঃ আবদুল হাই সাহেব। দারুল-উলূমের মসজিদ সংলগ্ন সংরক্ষিত কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ٥

ওহীর তাৎপর্য

কোরআন করীম যেহেতু 'ওহী'র মাধ্যমে সরওয়ারে-কায়েনাত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, সেহেতু কোরআন চর্চার আগে ওহী সম্পর্কিত কিছু দরকারী কথা জেনে নেওয়া কর্তব্য।

ওহীর প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যেক মুসলমানই জানেন যে, আল্লাহ্ পাক পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে মানব জাতিকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন এবং তাদের উপর কতকগুলো বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করে সমগ্র সৃষ্টি জগতকেই মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন। তদনুসারে জীবনে প্রত্যেক মানুষের উপরই দু'টি মৌলিক কর্তব্য বর্তায়। প্রথমত, সৃষ্টি জগতের যেসব বস্তু সে ব্যবহার করবে, সেগুলোর ব্যবহার যেন যথার্থ হয় এবং দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রতিটি বস্তু ব্যবহার করার সময় তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও আদেশ-নিষেধের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখতে হবে। সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যেন তার কোন কাজ বা আচরণ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে না হয়।

উপরিউক্ত দু'টি বিষয়ে পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করার জন্যই ইল্‌ম বা জ্ঞানের প্রয়োজন। কেননা প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে থাকা বস্তুনিচয়ের কোন্‌টির মধ্যে কি গুণ নিহিত রয়েছে, আর কোন্ প্রক্রিয়ার দ্বারাই বা সেগুলোর মাধ্যমে উপকার লাভ করা যায়, সে সম্পর্কিত সুস্থ জ্ঞান আয়ত্ত করা ছাড়া বস্তুজগত দ্বারা পরিপূর্ণ উপকার লাভ করা সম্ভব নয়।

অপরদিকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথ কোন্‌টি, কোন্ কোন্ কাজ আল্লাহ্‌র পছন্দ এবং কোন্‌গুলো অপছন্দ, সে ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকেফহাল না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি মোতাবেক জীবন যাপন করা সম্ভব হবে না।

এ কারণেই আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন জ্ঞান-অভিজ্ঞতা লাভ করার অবলম্বনস্বরূপ মানুষকে তিনটি বিষয় দান করেছেন। প্রথমটি তার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, দ্বিতীয়টি বোধি বা জ্ঞান এবং তৃতীয়টি ওহী।

মানুষ অনেক কিছুই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পারে। বোধির মাধ্যমেও সে অনেক জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু যে সমস্ত বিষয় ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা কিংবা

বোধিরও আওতার বাইরে, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সেসব জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ওহীর জ্ঞান দান করেছেন। ওহীর মাধ্যমেই মানুষ তার বোধগম্য জগতেরও বহু উর্ধ্ব জগতের খবর প্রাপ্ত হয়েছে।

'ইল্‌ম' বা জ্ঞানের উপরিউক্ত তিনটি উৎস আবার পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত। প্রতিটিরই আবার একটা নিজস্ব পরিমণ্ডল রয়েছে। নিজস্ব পরিমণ্ডলের সীমারেখার বাইরে এর কার্যকারিতা থাকে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, বুদ্ধি সেখানে কোন কাজ দেয় না। যেমন, একটা চুনকাম করা দেয়াল চোখে দেখে আপনি বলে দিতে পারেন যে, দেয়ালটির রং সাদা। কিন্তু চোখে না দেখে আপনি যতই বুদ্ধি খাটান না কেন, দেয়ালের রং সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা আপনার পক্ষে সহজ হবে না।

অনুরূপ বুদ্ধির মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করতে হয়, তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মাধ্যমে সহজ হয় না। যেমন, কোন একটা জিনিস শুধু চোখে কিংবা হাতে স্পর্শ করেই আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না যে, এটা প্রকৃতির সৃষ্টি, না কোন কারিগরের তৈরী। বলা বাহুল্য, বস্তুর গুণাগুণ বিচার করে এ ব্যাপারে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য।

মোটকথা, পঞ্চ-ইন্দ্রিয় যে সীমারেখা পর্যন্ত কাজ করে, বুদ্ধির সেখানে প্রয়োজন পড়ে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের সীমা যেখানে শেষ হয়ে যায়, সেখান থেকেই বুদ্ধির কার্যকারিতা শুরু হয়। বুদ্ধির কার্যকারিতাও কিন্তু সীমাহীন নয়। একটা পর্যায়ে এসে বুদ্ধির কার্যকারিতাও শেষ হয়ে যায়। তাই দেখা যায়, এমন অনেক তথ্য এবং মানব মনের এমন অনেক জিজ্ঞাসা রয়েছে, যেগুলোর জবাব দিতে গিয়ে বুদ্ধি এবং অনুভূতির সম্মিলিত শক্তিও ব্যর্থ হয়ে যায়।

আবার সেই দেয়ালটির প্রসঙ্গেই আসা যাক। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, দেয়ালটি কিভাবে ব্যবহার করলে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হবেন এবং কিভাবে ব্যবহার করলে অসন্তুষ্ট হবেন। তবে এ প্রশ্নের জবাব ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা বা বুদ্ধির নিকট থেকে আশা করা যায় না। এ ধরনের বুদ্ধি-অভিজ্ঞতার অতীত বিষয়াদি সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দান করার জন্যই আল্লাহ্ **তায়ালা আম্বিয়া কিরামকে** ওহীর জ্ঞান দান করেছেন। এ জ্ঞান কিছু সংখ্যক মনোনীত বান্দার মাধ্যমে মানব জাতিকে দান করা হয়েছে। ওহীর জ্ঞানপ্রাপ্ত সেসব মনোনীত বান্দাগণই 'নবী-রসূল' নামে অভিহিত হয়েছেন।

মোটকথা, ওহী মানব জাতির প্রতি প্রদত্ত জ্ঞানের সেই উচ্চতর উৎস, যে উৎসের মাধ্যমে মানুষ তার জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অপরিহার্য সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হতে পারে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান-অভিজ্ঞতা কিংবা বুদ্ধির প্রখরতা সেখানে সম্পূর্ণ অপারগ।

এতদসঙ্গে এ সত্যটুকুও স্বীকার করতে হয় যে, শুধুমাত্র বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা মানুষকে অভ্রান্ত পথনির্দেশ করার ব্যাপারে যথেষ্ট নয়, প্রকৃত পথনির্দেশ বা হেদায়েতের জন্য ওহীর ইল্‌ম অপরিহার্য।

বুদ্ধির সীমা যেখানে শেষ, এর পর থেকেই যেহেতু ওহীর জ্ঞানের কার্যকারিতা শুরু

হয়, সেজন্য ওহীর বিষয়বস্তু শুধু বুদ্ধির মাপকাঠিতে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। যেমন, যে কোন একটি বস্তুর বর্ণ নিরূপণ করার জন্য দৃষ্টিশক্তির ব্যবহার জরুরী, শুধু বুদ্ধির প্রয়োগ কার্যকর নয়; তেমনি দ্বীনী আকীদার অনেক বিষয়ই ওহীর জ্ঞানের দ্বারা বুঝতে হয়। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধির উপর নির্ভর করা বৈধও নয়, যথার্থও নয়।

যদি কোন লোক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বই স্বীকার না করে, তবে তার সামনে ওহীর প্রমাণ উত্থাপন করা অর্থহীন। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাঁর অপরিসীম ক্ষমতার প্রতি ঈমান রাখে, তাদের পক্ষে বুদ্ধির মাধ্যমেই ওহীর যথার্থতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা অনুধাবন করা অসম্ভব নয়।

যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, এ মহাবিশ্ব এবং এতে যা কিছু আছে, সে সবই একজন মহাজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি, তিনিই পরম নিপুণতার সাথে এ বিশ্ব-প্রকৃতির পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করছেন, কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তিনি মানুষকে এ দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস করতে হয় যে, দয়াময় সেই সৃষ্টিকর্তা এ অন্ধকার দুনিয়াতে কোন একটা ইঙ্গিত-ইশারা এবং আমাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করার নিয়ম-কানুন না দিয়ে প্রেরণ করেন নি। কেননা, আমরা এ দুনিয়ায় কেন প্রেরিত হয়েছি, এখানে আমাদের দায়িত্ব কি, আমাদের এ জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যই বা কি, কিভাবেই বা আমরা জীবনের সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম হবো, এ সম্পর্কিত পরিপূর্ণ জ্ঞান স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই আমাদেরকে দিয়েছেন, প্রতিটি প্রয়োজনের মুহূর্তে পরম যত্নে তা পরিবেশন করেছেন।

যে কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষ সম্পর্কে কি এরূপ ভাবা যায় যে, তিনি তাঁর কোন লোককে বিদেশে সফরে পাঠালেন, কিন্তু পাঠানোর সময় কিংবা তারপরেও লোক মারফত বা পত্র-যোগে তার কি কর্তব্য, কোন্ কোন্ কাজ সমাধা করে তাকে ফিরতে হবে, সফরে কিভাবে সে জীবন-যাপন করবে, সে সম্পর্কিত কোন নির্দেশই দিলেন না! যদি একজন সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সম্পর্কে এরূপ দায়িত্বহীন আচরণ আশা করা না যায়, তবে সেই মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ সম্পর্কে এরূপ ধারণা কি করে হতে পারে যে, যিনি এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং কল্পনাতীত নৈপুণ্যের সাথে এ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ-বাতাস প্রভৃতি সবকিছু একটা সুনির্ধারিত নিয়মের ভিতর পরিচালনা করছেন, তিনি তাঁর বান্দাদের এ দুনিয়ায় কিছু গুরু দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন, কিন্তু তাদের জন্য কোন নির্দেশনামা, জীবনপথে চলার মত সঠিক হেদায়েত বা পথনির্দেশ প্রেরণ করার সুব্যবস্থা করেন নি।

আল্লাহ্ তা'আলার মহাপ্রাজ্ঞ অস্তিত্ব সম্পর্কে যাদের ঈমান রয়েছে, তারা অবশ্যই স্বীকার করতে বাধ্য যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে অন্ধকারে হারিয়ে ফেলার জন্য হেদায়েতবিহীন অবস্থায় ছেড়ে দেন নি—বান্দাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান বাতলানোর উদ্দেশ্যে একটা নিয়মিত পন্থা দান করেছেন। বলা বাহুল্য, সেই নিয়মিত পন্থাটিই ওহীয়ে-ইলাহী নামে পরিচিত।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ওহী

ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত একটা বিষয়ই শুধু নয়, বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবেই একটা বাস্তব প্রয়োজনও বটে, যা অস্বীকার করা আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞাবান অস্তিত্বকেই অস্বীকার করার নামান্তর মাত্র।

হুযুর (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার পদ্ধতি

ওহী এবং রিসালাতের এ পবিত্র ধারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত এসে সমাপ্তি লাভ করেছে। তারপর আর কোন মানুষের প্রতি ওহী নাযিল হয়নি—হওয়ার প্রয়োজনও নেই।

রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি বিভিন্নভাবে ওহী নাযিল হতো। সহীহ্ বোখারীতে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার হযরত হারেস ইবনে-হিশাম (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন ঃ হুযুর, আপনার নিকট ওহী কিভাবে আসে ? হুযুর (সা) জবাব দিলেন ঃ কোন কোন সময় আমি ঘন্টার আওয়াযের মত শুনি। ওহী নাযিলের এ অবস্থাটা আমার পক্ষে খুব কঠিন প্রতীয়মান হয়। এ অবস্থা শেষ হওয়ার পর ঘন্টার মত আওয়াযের মাধ্যমে আমাকে যা কিছু বলা হয়, সে সবই আমার কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। কখনও কখনও আমার সামনে ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে হাযির হন। (বোখারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২)

এ হাদীসে ওহীর আওয়াযকে রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক ঘন্টার আওয়াযের সাথে তুলনা দেওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কানে এক ধরনের নৈসর্গিক আওয়ায অনুভূত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র কালাম প্রাপ্তিও ছিল ওহী নাযিল হওয়ার একটা পদ্ধতি। এ আওয়াযকে হুযুর (সা) ঘন্টার অবিরাম আওয়াযের মতো বলে বর্ণনা করেছেন।

বিরতিহীনভাবে ঘন্টা যখন একটানা বাজতে থাকে, তখন এ আওয়ায কোন্ দিক থেকে আসছে, তা নির্ণয় করা সাধারণত শ্রোতার পক্ষে সম্ভব হয় না। মনে হয়, চারদিক থেকেই বুঝি আওয়ায ভেসে আসছে! ওহীর আওয়ায কেমন অনুভূত হতো—একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই তা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য করার উদ্দেশ্যেই সেই পবিত্র আওয়াযকে ঘন্টাধ্বনির সাথে তুলনা করা হয়েছে। (ফয়যুল-বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯, ২০)

আওয়ায সহকারে ওহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর তা অত্যন্ত কঠিন অনুভূত হতো। উক্ত হাদীসের শেষ ভাগে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, শীতের দিনেও আমি হুযুর (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হতে দেখেছি। ওহী নাযিল হওয়া শেষ হলে পর প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও হুযুর (সা)-এর ললাটদেশ সম্পূর্ণরূপে ঘর্মাক্ত হয়ে যেতো। অন্য এক বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ওহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শ্বাস-প্রশ্বাস ফুলে ফুলে উঠতো, পবিত্র চেহারাও বিবর্ণ হয়ে শুকনা খেজুর শাখার ন্যায় ধূসর মনে হতো। একদিকে ঠাণ্ডায় সামনের দাঁতে ঠোকাঠুকি শুরু হতো এবং অপরদিকে শরীর এমন ঘর্মাক্ত হতো যে, মুক্তার মতো স্বেদবিন্দু ঝরতে থাকতো।—(আল্-এতকান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬)

ওহীর এই পদ্ধতি অনেক সময় এমন গুরুভার হতো যে, হুযুর (সা) কোন জানোয়ারের উপর সওয়ার অবস্থায় থাকলে সে জানোয়ার ওহীর চাপ সহ্য করতে অপারগ হয়ে মাটিতে বসে পড়তো।

একবার হুযুর (সা) সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর কোলে মাথা রেখে একটু আরাম করছিলেন। এ অবস্থায়ই ওহী নাযিল হতে শুরু করলো। হযরত যায়েদ বলেন, তখন তাঁর উরুদেশে এমন চাপ অনুভূত হচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল, তাঁর উরুর হাড় বোধ হয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। (যাদুল-মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮, ১৯)

এ পদ্ধতিতে নাযিল হওয়া ওহীর হালকা মৃদু আওয়ায কোন কোন সময় অন্যদের কানে গিয়েও পৌঁছতো। হযরত ওমর (রা) বর্ণনা করেন, কোন কোন সময় ওহী নাযিল হওয়া অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখমণ্ডলের চারদিকে মধুমক্ষিকার গুঞ্জনের ন্যায় গুণ গুণ শব্দ শোনা যেতো। (মসনদে আহমদ, কিতাবুস সিরাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১২)

ওহী নাযিল হওয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল—ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ) মানুষের বেশে আগমন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পয়গাম পৌঁছে দিতেন। এ অবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আ)-কে সাধারণত প্রখ্যাত সাহাবী হযরত দাহিয়া কালবী (রা)-র আকৃতিতে দেখা যেতো। কোন কোন সময় তিনি অন্য লোকের অকৃতি ধারণ করেও আসতেন।

মানুষের বেশে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর আগমন এবং ওহী পৌঁছে দেওয়ার এ পদ্ধতিটাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সর্বাপেক্ষা সহজ মনে হতো বলে তিনি এরশাদ করেছেন। (আল্-এতক্বান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৬)

তৃতীয় পদ্ধতিটি ছিল, হযরত জিবরাঈল (আ) অন্য কোন রূপ ধারণ না করে সরাসরি নিজের আসল রূপেই আবির্ভূত হতেন। জীবনে মাত্র তিনবার আল্লাহ্র রাসূল (সা) হযরত জিবরাঈলকে আসল রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। একবার হযরত জিবরাঈল (আ)-কে আসল রূপে দেখবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় তিনি স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার মি'রাজের রাতে ও তৃতীয়বার নবুওয়তের প্রাথমিক যুগে মক্কা শরীফের 'আজইয়াদ' নামক স্থানে। প্রথম দু'বারের কথা সহী সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয়বারের দেখা সম্পর্কিত বর্ণনা সনদের দিক দিয়ে দুর্বল ও সন্দেহযুক্ত। (ফতহুল-বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮ ও ১৯)

চতুর্থ পদ্ধতি ছিল, কোন মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি আল্লাহ্র সঙ্গে বাক্যালাপ। এ বিশেষ মর্যাদা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জাগ্রত অবস্থায় মাত্র একবার মি'রাজের রাত্রিতে লাভ করেছিলেন। অন্য একবার স্বপ্নযোগেও তিনি আল্লাহ্র সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন। (আল-এতক্বান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬)

ওহীর পঞ্চম পদ্ধতি ছিল, হযরত জিবরাঈল (আ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দেখা না দিয়ে হুযুর (সা)-এর পবিত্র অন্তরের মধ্যে কোন কথা ফেলে দিতেন। পরিভাষায় এ পদ্ধতিকে "নাফছ ফির-রূহ" বলা হয়। (এতক্বান; ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩)।

কোরআন নাযিলের ইতিহাস

কোরআন করীম আল্লাহ্‌র কালাম। তাই সৃষ্টির সূচনা থেকেই তা লওহে-মাহফুযে সুরক্ষিত রয়েছে। খোদ কোরআনের এরশাদঃ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ "বরং তা (সেই) কোরআন (যা) লওহে-মাহফুযে সুরক্ষিত রয়েছে।" অতঃপর দুই পর্যায়ে কোরআন নাযিল হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণ কোরআন একই সঙ্গে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে 'বাইতুল-ইযযতে' নাযিল করা হয়। 'বাইতুল-ইযযত' যাকে বাইতুল-মা'মূরও বলা হয়, এটি কা'বা শরীফের বরাবরে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে ফেরেশতাগণের এবাদতগাহ। এখানে পবিত্র কোরআন এক সাথে লাইলাতুল ক্বদরে নাযিল করা হয়েছিল। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি ধীরে ধীরে প্রয়োজনমত অল্প অল্প অংশ নাযিল হয়ে দীর্ঘ তেইশ বছরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

কোরআন নাযিলের এ দু'টি পর্যায়ের কথা খোদ কোরআনের বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। এ ছাড়া নাসায়ী, বায়হাকী, হাকেম প্রমুখ মুহাদ্দেস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এমন কতগুলো রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, যার মর্মার্থ হচ্ছে যে, কোরআন মজীদ এক সাথে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে এবং পরে ধীরে ধীরে দীর্ঘ তেইশ বছরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল হয়েছে। (আল-এতক্বান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১)

কোরআন এক সাথে দুনিয়ার আসমানে নাযিল করার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ শামাহ (রা) বলেন, এতদ্বারা কোরআনের উচ্চতম মর্যাদা প্রকাশ করাই ছিল উদ্দেশ্য। তাছাড়া ফেরেশতাগণকেও এ তথ্য অবগত করানো উদ্দেশ্য ছিল যে, এটিই আল্লাহ্‌র শেষ কিতাব, যা দুনিয়ায় মানুষের হেদায়েতের জন্য নাযিল করা হচ্ছে।

শায়খ যুরকানী (রহ) জন্য আর-একটি তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,—এভাবে দুইবারে নাযিল করে একথাও বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে, এই কিতাব সর্বপ্রকার সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে। তদুপরি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র বক্ষদেশ ছাড়াও আরো দুজায়গায় ইহা সুরক্ষিত রয়েছে,—একটি লওহে-মাহ্‌ফুয এবং অন্যটি বাইতুল-মা'মূর। (মানাহেলুল ইরফান ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯)

এ ব্যাপারেও প্রায় সবাই একমত যে, রাসূলে করীম (সা)-এর প্রতি কোরআনের পর্যায়ক্রমিক অবতারণ শুরু হওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। সহীহ্‌ বর্ণনায় একথাও জানা যায় যে, এ অবতারণ শুরু হয়েছিল লাইলাতুল-ক্বদরে ; রমযান মাসের সেই তারিখে, যে তারিখে হিজরতের পর বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সে রাত্রিটি রমযানের কত তারিখে ছিল এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কারো মতে সতেরই রমযান, কারো মতে উনিশে রমযান এবং কারো মতে সাতাইশে রমযানের রাত্রি। (ইবনে জরীর)

সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো নাযিল হয়, সেগুলো ছিল সূরায়ে-আলাক-এর প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত।

সহীহ বোখারীতে এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন—হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি ওহী নাযিলের সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। এর পর থেকেই তাঁর মধ্যে নির্জনে ইবাদত করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ সময় তিনি হেরা গুহায় রাতের পর রাত ইবাদতে কাটাতে থাকেন। এ অবস্থাতেই এক রাতে হেরা গুহায় তাঁর নিকট আল্লাহ্‌র ফেরেশতা আসেন এবং তাঁকে বলেন—اِقْرَأْ 'ইকরা' (পড়ুন)।

হুযুর (সা) জবাব দেন ঃ আমি পড়তে জানি না।

পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে হুযুর (সা) বলেন ঃ আমার জবাব শুনে ফেরেশতা আমাকে জড়িয়ে ধরেন এবং এমনভাবে চাপ দেন যে, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ি। এর পর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, 'পড়ুন।' আমি এবারও বলি, আমি পড়তে জানি না। তখন ফেরেশতা পুনরায় আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন চাপ দিলেন যে, আমি অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করতে থাকি। এর পর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন।' এবারও আমি সেই একই জবাব দেই যে, আমি পড়তে জানি না। এ জবাব শুনে ফেরেশতা আবারও আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভীষণ-ভাবে চাপ দিলেন যে, আমি চরম ক্লান্তি অনুভব করতে থাকি।

অতঃপর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলতে লাগলেন ঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ... ۝

"পড়ুন, আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্ত থেকে। পড়ুন এবং আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত অনুগ্রহপরায়ণ।"

এ'ই ছিল তাঁর প্রতি অবতীর্ণ সর্বপ্রথম কয়েকটি আয়াত। এর পর তিন বৎসরকাল ওহী নাযিলের ধারা বন্ধ থাকে। এ সময়টুকুকে "ফাতরাতুল-ওহী"-র কাল বলা হয়।

তিন বছর পর হেরা গুহায় আগমনকারী সেই ফেরেশতাকেই তিনি আসমান ও জমিনের মধ্যস্থলে দেখতে পেলেন। ফেরেশতা তাঁকে সূরা মুদ্দাস্‌সির-এর কয়েকটি আয়াত শোনালেন। এরপর থেকেই নিয়মিত ওহী নাযিলের ধারাবাহিকতা শুরু হলো।

মক্কী ও মদনী আয়াত

আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, কোরআন শরীফের সূরাগুলোর উপরে কোন

কোনটিতে 'মক্কী' এবং কোন কোনটিতে 'মদনী' লেখা রয়েছে। এ ব্যাপারে নির্ভুল ধারণা লাভ করা জরুরী।

মুফাস্‌সিরগণের পরিভাষায় মক্কী সূরা বা আয়াতের মর্ম হচ্ছে যেসব সূরা বা আয়াত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পূর্ব পর্যন্ত নাযিল হয়েছে এবং মদনী আয়াত হলো যেগুলো মদীনায় হিজরত করার পর নাযিল হয়েছে।

কোন কোন লোক মক্কী আয়াত বলতে যেগুলো মক্কা শহরে এবং মদনী বলতে যেগুলো মদীনায় নাযিল হয়েছে সেগুলোকে বুঝে থাকেন। এ ধারণা ঠিক নয়। এমনও অনেক আয়াত আছে, যেগুলো মক্কা শহরে নাযিল হয়নি, কিন্তু যেহেতু হিজরতের আগে নাযিল হয়েছে এজন্য এগুলোকে মক্কী বলা হয়। তেমনি যেসব আয়াত মদীনা, আরাফাত কিংবা মি'রাজের সফরে নাযিল হয়েছে, এমন কি হিজরতের সময় মদীনায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত পথে পথে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে, সেগুলোকেও মক্কী বলা হয়।

তেমনি অনেক আয়াত আছে, যেগুলো মদীনা শহরে নাযিল হয়নি, কিন্তু সেগুলো মদনী। হিজরতের পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অনেকগুলো সফরে বের হতে হয়েছে। অনেক সময় মদীনা থেকে শত শত মাইল দূরেও গিয়েছেন, কিন্তু এসব স্থানে অবতীর্ণ আয়াতগুলোকেও মদনীই বলা হয়। এমন কি যে সমস্ত আয়াত মক্কা বিজয়, হুদায়বিয়ার সন্ধি প্রভৃতি সময়ে খোদ মক্কা শহর কিংবা তার আশেপাশে নাযিল হয়েছে, সেগুলোকেও মদনী বলা হয়।

কোরআন শরীফের আয়াত ঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا -

খাস মক্কা শহরেই নাযিল হয়েছে, কিন্তু হিজরতের পরে নাযিল হওয়ার কারণে এই আয়াতও মদনী। (আল-বুরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮; মানাহেলুল-ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮)

কোন কোন সূরার সম্পূর্ণটাই মক্কী, যেমন, সূরা মুদ্দাসসির অপরদিকে কোন কোন সূরার সম্পূর্ণটাই মদনী, যেমন সূরা আলে-ইমরান। কিন্তু এমনও রয়েছে যে, সম্পূর্ণ সূরা হয়ত মক্কী, কিন্তু তার মধ্যে দু' একটি মদনী আয়াত সন্নিবেশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ মদনী সূরার মধ্যে দু' একটা মক্কী আয়াত সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যেমন, সূরা আ'রাফ মক্কী কিন্তু এ সূরার ঃ

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ

থেকে শুরু করে وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ পর্যন্ত কয়েকটি আয়াত মদনী।

অনুরূপ সূরায়ে হজ্জ মদনী; কিন্তু এ সূরার মধ্যেই وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

عَذَابَ يَوْمٍ عَقِيمٍ থেকে শুরু করে مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰى পর্যন্ত চারটি আয়াত মক্কী অর্থাৎ হিজরত-পূর্ববর্তী সময়ে অবতীর্ণ।

উপরিউক্ত আলোচনায় এও জানা গেল যে, কোন সূরাকে মক্কী বা মদনী গণ্য করার ব্যাপারে অধিকাংশ আয়াতের অনুপাত গণ্য করা হয় অর্থাৎ মক্কী আয়াতের সংখ্যা বেশী হলে সে সূরাকে মক্কী ও মদনী আয়াতের সংখ্যা বেশী হলে সে সূরাকে মদনী গণ্য করা হয়েছে।

যেসব সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো হিজরতের আগে নাযিল হয়েছে, সেগুলোর অবশিষ্ট আয়াত হিজরত-পরবর্তী সময়ে নাযিল হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে মক্কী সূরা বলেই অভিহিত করা হয়েছে। (মানাহেলুল ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯২)

মক্কী ও মদনী আয়াতসমূহের বৈশিষ্ট্য

ইলমে-তফসীরের বিশেষজ্ঞগণ মক্কী ও মদনী সূরাগুলো বাছাই করে এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন, যে বৈশিষ্ট্যের আলোকে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায়, সূরাটি মক্কী না মদনী। তাঁদের নির্দেশিত বৈশিষ্ট্যগুলোর কয়েকটি এমন যে, সেগুলোকে স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতির পর্যায়ে ফেলা যায়। কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আবার এরূপ যে, এগুলো দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে, এ বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সূরাগুলো মক্কী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী না মদনী হওয়ার।

মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) যেসব সূরায় كَلَّا শব্দ অর্থাৎ 'কখনই নয়' ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো মক্কী। এ শব্দটি বিভিন্ন সূরায় তেত্রিশবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং সবগুলো সূরা কোরআনুল করীমের শেষার্ধে রয়েছে।

(২) যেসব সূরায় (হানাফী মযহাব মতে) সেজদার আয়াত এসেছে, সেগুলো মক্কী।

(৩) সূরা বাক্বারাহ্ ব্যতীত যেসব সূরায় আদম (আ) ও ইবলীসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো মক্কী।

(৪) যেসব সূরায় জেহাদের নির্দেশ অথবা নিয়ম-কানুন বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো মদনী।

(৫) যেসব আয়াতে মুনাফিকদের প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে সেগুলো মদনী।

নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু স্থান বিশেষে বিপরীতও হয়ে থাকে।

(১) মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে সাধারণত يَا اَيُّهَا النَّاس অর্থাৎ 'হে মানব

সন্তানগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অপরপক্ষে মদনী সূরায় يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

(২) মক্কী আয়াত সাধারণত ছোট ও সংক্ষিপ্ত। অপরপক্ষে মদনী সূরা ও আয়াত সাধারণত দীর্ঘ ও বিশ্লেষাত্মক।

(৩) মক্কী সূরাগুলোতে সাধারণত তওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত সপ্রমাণ করা, হাশর ও শেষ বিচারের চিত্র বর্ণনা, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। এগুলোতে আহকাম ও আইন-কানুন অপেক্ষাকৃত কম বিবৃত হয়েছে। অপরপক্ষে মদনী আয়াতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক নিয়মনীতি, আইন-কানুন, জেহাদের নির্দেশ এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিধিবিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

(৪) মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে প্রতিপক্ষ হিসাবে সাধারণত মুশরিক ও মূর্তিপূজক-দের দেখানো হয়েছে। অপরপক্ষে মদনী সূরাগুলোর মধ্যে আহ্‌লে-কিতাব ও মুনাফিক-দের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

(৫) মক্কী সূরাগুলোর বর্ণনারীতি সাধারণত অত্যন্ত অলংকারবহুল এবং এগুলোতে উপমা-উৎপ্রেক্ষা অত্যন্ত বর্ণাঢ্য ভঙ্গীতে উপস্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু এসব সূরায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ শব্দসম্ভারের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। অপরপক্ষে মদনী সূরাগুলোর বর্ণনাভঙ্গী অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজবোধ্য।

মক্কী ও মদনী সূরার বর্ণনাভঙ্গী ও শব্দ ব্যবহার ক্ষেত্রে এ পার্থক্য হয়েছে সাধারণত সমাজ-পরিবেশ, যাদের সম্বোধন করা হয়েছে তাদের রুচির তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য করে। মক্কার জীবনে মুসলমানদের মোকাবেলা ছিল যেহেতু আরবের মূর্তিপূজক মুশরিকদের সাথে এবং যেহেতু তখনও পর্যন্ত ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি সেজন্য তখনকার দিনে অবতীর্ণ আয়াতগুলোতে সাধারণত প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের সংস্কার, চরিত্র সংশোধন, মূর্তিপূজার অসারতা প্রমাণ এবং কোরআন করীমের অনন্য বর্ণনাভঙ্গীর মোকাবেলায় ভাষাজ্ঞানের গর্বে গর্বিত আরব সমাজকে নির্বাক করে দেওয়াই ছিল প্রধান লক্ষ্য। সেজন্যই অত্যন্ত আবেগময় বর্ণনাভঙ্গীর অবতারণা করা হয়েছিল। অপরদিকে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর লোক দলে দলে এসে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছিল। শিরক ও মূর্তিপূজার অসারতা অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্যভাবেই সপ্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। সর্বোপরি আদর্শের ক্ষেত্রে সকল মোকাবেলা ছিল আহ্‌লে-কিতাব সম্প্রদায়ের সাথে, সেজন্য এই সময়কার আয়াতগুলোতে আইন-কানুন, নিয়মনীতি ও আহ্‌লে-কিতাবদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহের যুক্তিপূর্ণ জবাব দানের প্রতি বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে বর্ণনাভঙ্গীর ক্ষেত্রেও যুক্তিপূর্ণ সরল পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে।

কোরআন পর্যায়ক্রমে নাযিল হলো কেন

আগেই বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআনুল করীম একবারে একই সঙ্গে নাযিল না হয়ে

ধীরে ধীরে তেইশ বছরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। কোন কোন সময় হযরত জিবরাঈল (আ) খুব ছোট একখানা আয়াত, এমনকি কোন আয়াতের ছোট একটা অংশ নিয়েও এসেছেন। কোন কোন সময় আবার কয়েকটি আয়াতও এক সাথে নাযিল করা হয়েছে।

কোরআনের সর্বাপেক্ষা ছোট যে আয়াতাংশ নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর আগমন হয়েছে, তা ছিল সূরা নিসার একটি দীর্ঘ আয়াতের ছোট এক অংশ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ অথচ অপরদিকে সমগ্র সূরা আন্'আম একই সঙ্গে নাযিল করা হয়েছে।

কোরআন শরীফকে একবারে নাযিল না করে অল্প অল্প করে কেন নাযিল করা হলো, এ প্রশ্ন আরবের মুশরিকরাও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনে উত্থাপন করেছিল। এ প্রশ্নের জবাব আল্লাহ্ পাক নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রদান করেছেন ঃ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ○

অর্থাৎ "এবং কাফেররা বলে, কোরআন তাঁর প্রতি একবারে কেন নাযিল করা হলো না ? এইভাবে (ধীরে ধীরে আমি পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি) যেন আপনার অন্তরে তা দৃঢ়মূল করে দেওয়া যায়। এবং আমি ধীরে ধীরে তা পাঠ করেছি। তা ছাড়া এরা এমন কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না, যার (মোকাবেলায়) আমি যথার্থ সত্য এবং তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পেশ করব না।"

উপরিউক্ত আয়াতের তফসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম রাযী কোরআন শরীফ পর্যায়-ক্রমে নাযিল হওয়ার যে তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, সেটুকু বুঝে নেওয়াই এখানে যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। তিনি লিখেছেন ঃ

(১) রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উম্মী ছিলেন, লেখাপড়ার চর্চা করতেন না। এমতাবস্থায় কোরআন যদি একই সাথে একবারে নাযিল হতো, তবে তা স্মরণ রাখা বা অন্য কোন পন্থায় সংরক্ষণ করা হয়ত তাঁর পক্ষে কঠিন হতো। অপর পক্ষে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যেহেতু লেখাপড়া জানতেন, সেজন্য তাঁর প্রতি তওরাত একই সঙ্গে নাযিল করা হয়েছিল। কারণ তিনি লিপিবদ্ধ আকারে তওরাত সংরক্ষণে সমর্থ ছিলেন।

(২) সমগ্র কোরআন যদি একই সঙ্গে নাযিল হতো, তবে সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের প্রতিটি হুকুম-আহকামের প্রতি আমল করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াতো। এতদ্বারা

শরীয়তে-মুহাম্মদীতে ধীরে ধীরে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতিটি আহকাম অনুসারিগণের গা-সওয়া করে নেওয়া এবং হাতে-কলমে সে সব নির্দেশের উপর আমল করার যে পন্থা অবলম্বিত হয়েছে, তা ব্যাহত হতো।

(৩) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রতিদিনই তাঁর কওমের তরফ থেকে যে নতুন নতুন নির্যাতনের সম্মুখীন হতেন, এ অবস্থায় কোরআনের আয়াতসহ হযরত জিবরাঈল (আ)-এর ঘন ঘন আগমন তাঁর মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে সহায়ক হতো।

(৪) কোরআন শরীফের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিরুদ্ধবাদীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব এবং বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। এমতাবস্থায় সেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার পর এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার মুহূর্তে সে সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়াই ছিল স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। এতে একাধারে যেমন মুমিনদের অন্তর-দৃষ্টি প্রসারিত হওয়ার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে, তেমনি সমকালীন বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে অগ্রিম সংবাদ প্রদানের ফলে কোরআনের অভ্রান্ততার দাবী অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য হয়েছে। (তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৬)

শানে নযুল প্রসঙ্গে

কোরআনের আয়াতসমূহ দু' ধরনের। এক ধরনের আয়াত হচ্ছে যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা নিজের তরফ থেকে কোন নির্দেশ বা উপদেশমূলক প্রসঙ্গ বর্ণনা উপলক্ষে নাযিল করেছেন, কোন বিশেষ ঘটনা কিংবা কারো কোন প্রশ্নের জওয়াব প্রদান প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে সেগুলো নাযিল হয়নি। অন্য এক ধরনের আয়াত রয়েছে, যেগুলো বিশেষ কোন ঘটনা উপলক্ষে কিংবা কোন প্রশ্নের জওয়াবে নাযিল হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঘটনা কিংবা প্রশ্নগুলোকে সে সব আয়াতের পটভূমি হিসাবে গণ্য করা যায়। এসব আয়াতের পশ্চাৎবর্তী সে পটভূমিকেই তফসীরের পরিভাষায় 'শানে-নযুল' বা 'সববে-নযুল' বলা হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ সূরা বাক্বারার নিম্নোক্ত আয়াতটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যেমনঃ

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ - وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۝

অর্থাৎ "মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যে পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে। একজন মুমিন বাঁদীও একটি মুশরিক নারী থেকে উত্তম, তোমাদের চোখে সে নারী যত আকর্ষণীয়ই মনে হোক না কেন।"

এ আয়াত একটা বিশেষ ঘটনার পটভূমিতে নাযিল হয়েছিল। ঘটনাটি হচ্ছে, হযরত মারসাদ ইবনে আবি মারসাদ নামক এক সাহাবীর জাহেলিয়াত যুগে 'এনাক' নাম্নী এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে গভীর প্রণয় ছিল। ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত মারসাদ (রা) হিজরত করে মদীনায় চলে যান, কিন্তু এনাক মক্কাতেই থেকে যান। একবার কোন কাজ উপলক্ষে

হযরত মারসাদ (রা) মক্কায় আগমন করলে এনাক তাঁকে পূর্ব আসক্তির ভিত্তিতে তাঁর সাথে রাত কাটানোর আমন্ত্রণ জানায়। হযরত মারসাদ (রা) সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বললেনঃ ইসলাম তোমার সাথে আমার অবাধ মিলনের পথে প্রাচীর সৃষ্টি করে দিয়েছে। এখন যদি তুমি একান্তই আমার সাথে মিলিত হতে আকাঙ্ক্ষী হও, তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি নিয়ে তোমাকে বিবাহ করতে পারি।

মদীনায় ফিরে এসে হযরত মারসাদ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট উক্ত স্ত্রীলোককে বিবাহ করার অনুমতি প্রার্থনা করলে এ আয়াত নাযিল হয়, যাতে মুমিনদের পক্ষে মুশরিক নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। (আসবাবুন নুযুল, ওয়াহেদী, পৃষ্ঠা ৩৮)

উপরিউক্ত ঘটনাটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আয়াতের শানে-নযুল বা আসবাবে-নযুল। তফসীরের ক্ষেত্রে শানে-নযুল অত্যন্ত গুরুত্ববহ। এমন অনেক আয়াত রয়েছে, যেগুলো নাযিল হওয়ার পটভূমি বা শানে-নযুল জানা না থাকলে সেগুলোর প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য উদ্ধার করা দুষ্কর।

সাত হরফ বা সাত ক্বেরাআত প্রসঙ্গ

উম্মতের সর্বশ্রেণীর মানুষের পক্ষেই তেলাওয়াত সহজতর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনের কিছু সংখ্যক শব্দ বিভিন্ন উচ্চারণে পাঠ করার সুযোগ প্রদান করেছেন। কেননা কোন কোন লোকের পক্ষে বিশেষ পদ্ধতিতে অক্ষর বিশেষের উচ্চারণ করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় সে সমস্ত লোক যদি তাদের পক্ষে সহজপাঠ্য এমন কোন উচ্চারণে সে শব্দটি পাঠ করে, তবে সে উচ্চারণও তাদের পক্ষে শুদ্ধ হবে।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, একদা রাসূলে-মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম গিফার গোত্রের জলাশয়ের পাশে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ) এসে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি হুকুম পাঠিয়েছেন, আপনি যেন আপনার উম্মতকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন, যেন তাদের সকলে একই উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জওয়াব দিলেনঃ আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রার্থনা জানিয়ে বলছি যে; আমার উম্মতের পক্ষে তা সম্ভব হবে না।

জওয়াব শুনে হযরত জিবরাঈল (আ) ফিরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি হুকুম প্রেরণ করেছেন, আপনি আপনার উম্মতকে এ মর্মে নির্দেশ দিন, যেন তারা অনধিক দুই উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত করে। রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জওয়াব দিলেনঃ আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা ও অনুগ্রহের দরখাস্ত পেশ করে বলছি, আমার উম্মতের এতটুকু ক্ষমতাও নেই। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) ফিরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর পুনরায় ফিরে এসে বললেনঃ আল্লাহ্ পাক আপনাকে হুকুম প্রেরণ করেছেন, আপনি উম্মতকে এ মর্মে আদেশ দিন যেন তারা সর্বাধিক তিন উচ্চারণে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র বিশেষ ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করে বলছি, আমার উম্মতের এতটুকু ক্ষমতাও নেই। জিবরাঈল (আ) এবারও ফিরে গেলেন এবং চতুর্থবার ফিরে এসে বললেন ঃ আল্লাহ্ পাক আপনার প্রতি হুকুম প্রেরণ করেছেন, আপনি আপনার উম্মতকে সাত উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত করার নির্দেশ দিন। অনুমোদিত সে সাত উচ্চারণের মধ্যে যিনি যে উচ্চারণেই পাঠ করুন না কেন, তার তেলাওয়াতই শুদ্ধ বলে গ্রহণ করা হবে।

(মানাহেলুল-ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৩)

এক হাদীসে রাসূলে মকবুল (সা) ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ০

অর্থাৎ এই কোরআন সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে। এর মধ্যে তোমাদের যার পক্ষে যেভাবে সহজ হয় সেভাবেই তেলাওয়াত কর। (বোখারী)

রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইরশাদে উল্লিখিত 'সাত হরফ'-এর অর্থ কি—এ সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তত্ত্বদর্শী আলেমগণের নিকট এ সম্পর্কে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ্ পাক কোরআন শরীফ যে ক্বেরাআতের সাথে নাযিল করেছেন, তার মধ্যে পারস্পরিক উচ্চারণ পার্থক্য সর্বাধিক সাত রকম হতে পারে। অনুমোদিত সে সাতটি ধরন নিম্নে লিখিত ভিত্তিতে হওয়া সম্ভব ঃ

(১) বিশেষ্যের উচ্চারণে তারতম্য। এতে এক বচন, দ্বি-বচন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তারতম্য হতে পারে। যেমন এক ক্বেরাআতে تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ এ আয়াতে 'কালেমাতু' শব্দটি এক বচনে এসেছে। কিন্তু অন্য ক্বেরাআতে শব্দটি বহুবচনে উচ্চারিত হয়ে تَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ পঠিত হয়েছে।

(২) ক্রিয়াপদে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতকালের বিভিন্নতা অবলম্বিত হয়েছে। যেমন প্রচলিত ক্বেরাআতে رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا পঠিত হয়েছে। এ আয়াতের অন্য ক্বেরাআতে رَبُّنَا بَاعَدَ بَيْنَ اَسْفَارِنَا পঠিত হয়েছে।

(৩) রীতি অনুসারে এরাব চিহ্ন বা যের-যবর-পেশ ইত্যাদি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মত-পার্থক্যের কারণে ক্বেরাআতে বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে।

যেমন,—وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ এর স্থলে কেউ কেউ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ পাঠ করেছেন।

অনুরূপ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ এর স্থলে ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ পাঠ করেছেন।

(৪) কোন কোন ক্বেরাআতে শব্দের কম-বেশীও হয়েছে। যেমন,— تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ এর স্থলে কেউ কেউ مِنْ শব্দ বাদ দিয়ে تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ পাঠ করেছেন।

(৫) কোন কোন ক্বেরাআতে শব্দের আগ-পাছও হয়েছে। যেমন—এক ক্বেরাআতে وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ এর স্থলে وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ এসেছে। এখানে ক্বেরাআতের পার্থক্যে 'হাক্ব' ও 'মাউত' (শব্দ দু'টি) আগে-পিছে হয়ে গেছে।

(৬) শব্দের পার্থক্য হয়েছে। এক ক্বেরাআতে এক শব্দ এবং অন্য ক্বেরাআতে তদস্থলে অন্য শব্দ পঠিত হয়েছে। যেমন—نُنْشِزُهَا এর স্থলে অন্য ক্বেরাআতে نَنْشُرُهَا পঠিত হয়েছে। فَتَبَيَّنُوْا এর স্থলে فَتَثَبَّتُوْا এবং طَلْحٍ এর স্থলে طَلْعٍ ও পঠিত হয়েছে।

(৭) উচ্চারণ পার্থক্য, যেমন কোন কোন শব্দের উচ্চারণভঙ্গী লম্বা, খাটো, হালকা, কঠিন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে শব্দের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না, শুধু উচ্চারণে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। যেমন مُوْسٰى শব্দটি কোন কোন ক্বেরাআতে مُوْسِىْ রূপে উচ্চারিত হয়েছে।

মোটকথা, উচ্চারণের সুবিধার্থে সাত ক্বেরাআতের মাধ্যমে তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে যেসব পার্থক্য অনুমোদন করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অর্থের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। শুধুমাত্র বিভিন্ন এলাকা ও শ্রেণী-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত উচ্চারণ-ধারার প্রতি লক্ষ্য রেখেই সাত ধরনের উচ্চারণ-রীতির অনুমোদন করা হয়েছে।

প্রাথমিক অবস্থায় কোরআনের উচ্চারণ-পদ্ধতির ব্যাপারে সাধারণ মানুষের পক্ষে পরিপূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব ছিল না বলেই আয়াতের উচ্চারণভঙ্গীতে

সুবিধামত পন্থা অবলম্বন করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রতি রমযান মাসে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সাথে কোরআন শরীফের পারস্পরিক তেলাওয়াত করতেন। একজনে পড়তেন, অন্যজনে তা শুনতেন। এভাবে শুদ্ধতম ক্বেরাআত-পদ্ধতিও সুনিশ্চিত হতো। শেষ বিদায়ের বছর রমযানে এ তেলাওয়াতের দু'টি খতম সম্পন্ন হয়েছিল। এ খতমকেই ক্বারীগণের পরিভাষায় عرضة اخيرة বা 'শেষ-দাওর' বলা হয়। এ উপলক্ষে তেলাওয়াত-পদ্ধতির শুদ্ধতম পন্থাগুলো বলে দিয়ে অন্যান্য সকল পঠন-পদ্ধতি বাতিল করে দেওয়া হয়। তারপর থেকে শুধুমাত্র ঐ সব ক্বেরাআতই অবশিষ্ট রাখা হয়েছে, যেগুলো আজ পর্যন্ত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরায় রক্ষিত হয়ে আসছে।

তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ভুল বোঝাবুঝি দূর করার উদ্দেশ্যে হযরত উসমান (রা) কোরআন শরীফের সাতখানা অনুলিপি তৈরী করেছিলেন। প্রতিটি অনুলিপি এমনভাবে লেখা হয়েছিল যে, এতে অনুমোদিত সাতটি ক্বেরাআতই পাঠ করা সম্ভব হতো। তখনও পর্যন্ত আরবী লেখন-পদ্ধতিতে যের-যবর-পেশ প্রভৃতি হরকত-এর প্রচলন না থাকায় সাধারণ যের-যবর-পেশ-এর পার্থক্য পাঠকগণ নিজেরাই নির্ণয় করে নিতে পারতেন। যেসব ক্ষেত্রে শব্দের বদল কিংবা অগ্রপশ্চাৎ অনুমোদিত রয়েছে, স্বতন্ত্র সাতটি নোসখাতে সে পার্থক্যগুলোও পৃথক পৃথকভাবে লিখে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে উম্মতের আলেম-ক্বারী ও হাফেযগণ ক্বেরাআত-পদ্ধতিগুলো সংরক্ষণ করার ব্যাপারে এত শ্রম ও সাধনা নিয়োগ করেছেন যে, অনুমোদিত ক্বেরাআত-রীতির বাইরে কোথাও নোক্তার পার্থক্যও আর কোরআন-পাকের পাঠ-রীতিতে অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হয়নি। সাধক আলেম-হাফেজ-ক্বারীগণের অগণিত লোক সে যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এ ক্বেরাআত-পদ্ধতির সুষ্ঠু সংরক্ষণের লক্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করে রেখেছেন।

হযরত উসমান (রা) তাঁর লিপিবদ্ধকৃত সাত ক্বেরাআতের অনুলিপি মুসলিম জাহানের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করার সময় সঙ্গে প্রতিটি ক্বেরাআতের দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্বারীও প্রেরণ করতেন। সেসব ক্বারী নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ পাণ্ডুলিপির অনুলিপির অনুরূপ পদ্ধতিতে ক্বেরাআত শিক্ষা দান করতেন। এভাবেই বিভিন্ন এলাকার অধিবাসিগণ অনুমোদিত ক্বেরাআত-পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল হয়ে যান। এ সব শিক্ষক-সাহাবীর কাছ থেকে যারা শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তাঁদের 'অনেকেই ইলমে-ক্বেরাআত' চর্চা এবং অন্যকে শিক্ষা দানের ব্যাপারে সমগ্র জীবন ওয়াক্‌ফ করে দেন। এভাবেই 'ইলমে-ক্বেরাআত' একটা স্বতন্ত্র বিষয়রূপে গড়ে ওঠে। প্রতিটি এলাকা থেকেই কিছু লোক 'ইলমে-ক্বেরাআতে' অধিকতর ব্যুৎপত্তি অর্জন করার উদ্দেশ্যে এ ইলমের ইমামগণের শরণাপন্ন হতে থাকেন। কেউ কেউ আবার দুই-তিন বা সাত ক্বেরাআতেই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ক্বেরাআতের ক্ষেত্রে এ ধরনের আগ্রহ ও সাধনার ফলে 'ইলমে-ক্বেরাআতের বিভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতি এমন কি ধ্বনিবিদ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত কাওয়ায়েদ-এর সৃষ্টি হয়। সর্বসম্মত

এসব কাওয়ায়েদ মুসলিম-জাহানের সকল জ্ঞানী কর্তৃক সমভাবে সমর্থিত ও অনুসৃত হতে থাকে।

ক্বেরাআতের পার্থক্যের ক্ষেত্রে যে কয়টি মূলনীতি সর্বসম্মতভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে, সংক্ষেপে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

এক. হযরত ওসমান (রা) কর্তৃক লিপিবদ্ধ লিখন-পদ্ধতির সাথে প্রতিটি ক্বেরাআত সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

দুই. আরবী ভাষার কাওয়ায়েদ বা ব্যাকরণের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে হবে।

তিন. পদ্ধতিটি নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে বর্ণিত এবং এ বর্ণনা ইলমে ক্বেরাআতের মশহুর আলেমগণের মধ্যে পরিচিত হতে হবে।

কোন ক্বেরাআতের মধ্যে যদি উপরিউক্ত তিনটি শর্তের যে কোন একটির অভাব দেখা যায়, তবে সে শব্দ, বাক্য বা পঠন-পদ্ধতি কোরআন শরীফের অংশরূপে কোন অবস্থাতেই গণ্য হবে না।

ক্বেরাআতের ব্যাপারে আলেমগণের এ অনন্য সাবধানতার ফলে বহু শিক্ষার্থী বিভিন্ন ক্বারীর ক্বেরাআত সংরক্ষণ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ সংরক্ষণ-প্রচেষ্টার দ্বারাই বিশ্বস্ত বর্ণনাকারিগণের বর্ণনাসূত্রের মাধ্যমে ইলমে ক্বেরাআতের শুদ্ধতম পদ্ধতি-গুলো যুগ পরম্পরায় চলে আসছে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থিগণের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে একই ইমাম বিভিন্ন পদ্ধতির ক্বেরাআত আয়ত্ত করে তা শিক্ষা দান করতে থাকেন। অনেকে আবার বিশেষ এক ধরনের ক্বেরাআতই আয়ত্ত করেন এবং তা শিক্ষা দান করতে থাকেন। ফলে সেই ক্বেরাআত সংশ্লিষ্ট ওস্তাদের নামে খ্যাত হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে আলেমগণ ক্বেরাআত-পদ্ধতিগুলোর খুঁটিনাটি সব দিক বিশ্লেষণ করে কিতাব লেখা শুরু করেন। সর্বপ্রথম ইমাম আবু ওবায়েদ কাসেম বিন সালাম, ইমাম আবু হাতেম সাজেস্তানী, কাজী ইসমায়ীল ও ইমাম আবু জাফর তাবারী এই ইল্‌ম সম্পর্কে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে আবু বকর ইবনে মুজাহিদ (ওফাত ৩২৪ হিঃ) একটি প্রামাণিক কিতাব লেখেন। এই কিতাবে সাত ক্বারীর ক্বেরাআতই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তাঁর এই কিতাব এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, পরবর্তী যুগে তাঁর কিতাবে উল্লিখিত সাত ক্বারীর ক্বেরাআতই সর্বসাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়। অনেকের মধ্যে এমন একটা ধারণা পর্যন্ত সৃষ্টি হয়ে যায় যে, ইমাম আবু বকর কর্তৃক উল্লিখিত সাত ধরনের পঠন পদ্ধতিই শুদ্ধ তম বর্ণনাভিত্তিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে এ পদ্ধতিগুলোই নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ইমাম ইবনুল-মুজাহিদ এ উদ্দেশ্যে সাতজন ক্বারীর ক্বেরাআত-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেন নি যে, এই সাতজনের ক্বেরাআতই শুদ্ধতম—এরূপ দাবীও তিনি কোথাও করেন নি।

ইমাম ইবনুল-মুজাহিদের কিতাব থেকে আরো একটি ভুল ধারণার সৃষ্টি এই হয়েছে যে, হাদীস শরীফে উল্লিখিত 'ছাবআতা-আহরূফ' বা সাত হরফের যে বর্ণনা রয়েছে তা বোধ হয় এ সাতজন ক্বারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধারণাও সত্য নয়। কেননা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, হাদীসে উল্লিখিত যে সাত পদ্ধতিতে কোরআন শরীফ নাযিল হয়েছে উপরে বর্ণিত তিন শর্তের মাপকাঠিতে যে সব পঠন-পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, সেগুলোই সেই সাত-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

সাত ক্বারী

ইমাম আবু বকর ইবনুল-মুজাহিদের কিতাব দ্বারা যে সাতজন ক্বারী সর্বাপেক্ষা বেশী খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন ঃ

১. **আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর আদদারী** (র) (ওফাত ১২০ হিঃ) ঃ ইনি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) ও হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) প্রমুখ তিনজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছেন। তাঁর ক্বেরাআত মক্কা শরীফে বেশী প্রচলিত হয়েছে। তাঁর ক্বেরাআতের বর্ণনাকারিগণের মধ্যে হযরত বাযযী (র) ও হযরত কান্‌বাল (র) অধিকতর খ্যাতি লাভ করেছেন।

২. **নাফে বিন আবদুর রহমান বিন আবু নায়ীম** (ওফাত ১৬৯ হিঃ) ঃ ইনি এমন সত্তর জন তাবেয়ী থেকে ইলমে-ক্বেরাআত শিক্ষা লাভ করেছিলেন, যাঁরা সরাসরি হযরত উবাই বিন কা'ব (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সাগরেদ ছিলেন। তাঁর ক্বেরাআত মদীনা শরীফে বেশী প্রসার লাভ করেছে। তাঁর বর্ণনাকারিগণের মধ্যে আবু মূসা কালুন (ওফাত ২২০ হিঃ) ও আবু সায়ীদ দরশ (ওফাত ১৯৭ হিঃ) অধিক খ্যাতি লাভ করেছেন।

৩. **আবদুল্লাহিল হিসবী** (ওফাত ১১৮ হিঃ) ঃ ইবনে 'আমের নামে খ্যাত। ইনি সাহাবীগণের মধ্যে হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা) ও হযরত ওয়াছেলা বিন আসকার (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করেছিলেন। ইল্‌মে ক্বেরাআত হযরত মুগীরা বিন শেহাব মাখযূমী থেকে হাসিল করেন। মুগীরা বিন শেহাব হযরত ওসমান (রা)-এর সাগরেদ ছিলেন। তাঁর ক্বেরাআতের বেশী প্রচলন হয়েছে সিরিয়ায়। তাঁর বর্ণনাকারি-গণের মধ্যে হেশাম ও যাকওয়ান বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

৪. **আবু আ'মার যাব্বান ইবনুল-আলা** (ওফাত ১৫৪ হিঃ) ঃ ইনি হযরত মুজাহিদ (রা) ও সায়ীদ ইবনুল জুবাইর (র)-এর মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত উবাই ইবনুল কা'ব (রা)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ক্বেরাআত বসরায় বেশী প্রসার লাভ করেছে। তাঁর বর্ণনাকারিগণের মধ্যে আবু উমারুদ-দুয়ালী (ওফাত ২৪৬ হিঃ) ও আবু শোয়াইব সূসীর (ওফাত ২৬১ হিঃ) খ্যাতি সমধিক।

৫. **হামযা বিন হাবীব আয-যাইয়্যাত** (ওফাত ১৮৮ হিঃ) ঃ ইনি ইকরামা বিন রবী আত্-তাইমীর মুক্ত-করা ক্রীতদাস ছিলেন। সুলায়মান আল-আ'মাশ-এর সাগরেদ।

সুলায়মান বিন ওয়াস্‌সাব-এর নিকট থেকে, তিনি যর বিন হোবাইশ-এর নিকট থেকে এবং ইয়াহ্‌ইয়া তিনি হযরত ওসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-এর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁর বর্ণনাকারিগণের মধ্যে খালফ বিন হেশাম (ওফাত ১৮৮ হিঃ) ও খাল্লাদ বিন খালেদ (ওফাত ২২০ হিঃ) বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

৬. **আসেম বিন্ আবিন্‌নাজুদ আল্-আসাদী** (ওফাত ১২৭ হিঃ) ঃ ইনি যর বিন হোবাইশ-এর মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) আবু আবদুর রহমান ছুলমার মাধ্যমে হযরত আলী (রা)-এর সাগরেদ। তাঁর ক্বেরাআতের বর্ণনাকারিগণের মধ্যে শা'বা বিন্ আইয়্যাশ (ওফাত ১৯৩ হিঃ) ও হাফস্ বিন সুলায়মান (ওফাত ১৮০ হিঃ) অধিক খ্যাতি লাভ করেছেন। বর্তমানে হাফস বিন সুলায়মানের বর্ণিত ক্বেরাআত-পদ্ধতিই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত।

৭. **আবুল হাসান আলী বিন হামযা আল্-কাসায়ী** (ওফাত ১৮৯ হিঃ) ঃ ইনি আরবী ভাষার প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ। তাঁর বর্ণনাকারিগণের মধ্যে আবুল হারেস মারওয়াযী (ওফাত ২৪০ হিঃ) ও আবু উমারুদ দাওরী সমধিক প্রসিদ্ধ।

শেষোক্ত তিন জনের ক্বেরাআত প্রধানত কুফা এলাকায় প্রচলিত হয়েছিল।

আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপরিউক্ত সাতজন ছাড়া আরো কয়েকটি ক্বেরাআত পদ্ধতি বহুল-বর্ণিত বিশ্বস্ত বর্ণনা সূত্রের মাধ্যমে পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগে যখন সাধারণের মধ্যে এরূপ একটা ভুল ধারণা ছড়িয়ে পড়লো যে, শুদ্ধতম ক্বেরাআত-পদ্ধতি উপরিউক্ত সাত ক্বেরাআতেই সীমাবদ্ধ, তখন সমকালীন আলেমগণের অনেকেই, বিশেষত, আল্লামা শাযায়ী ও আবু বকর মেহরান সাতের স্থলে দশটি ক্বেরাআত-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করে পুস্তক রচনা করেন। তাঁদের পুস্তকে পূর্বোল্লিখিত সাতজন ছাড়া আর যে তিন জনের ক্বেরাআত উল্লিখিত হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন ঃ

১. **ইয়াকুত বিন ইসহাক হাযরামী** (ওফাত ২০৫ হিঃ) ঃ তাঁর ক্বেরাআত বসরা এলাকায় বেশী প্রচলিত হয়েছিল।

২. **খালফ বিন হিশাম** (ওফাত ২০৫ হিঃ) ঃ ইনি হামযার ক্বেরাআতের বর্ণনাকারী ছিলেন। তাঁর ক্বেরাআত কুফায় বেশী বিস্তার লাভ করেছে।

৩. **আবু জাফর ইয়াযীদ বিন কা'কা'** (ওফাত ১৩০ হিঃ) ঃ তাঁর ক্বেরাআত মদীনা শরীফে সর্বাধিক প্রচলিত হয়।

পরবর্তীকালে কোন কোন গ্রন্থকার চৌদ্দ জন ক্বারীর ক্বেরাআত উল্লেখ করেছেন। পূর্বোক্ত দশজন ছাড়াও তাঁরা নিম্নোক্ত চারজনের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

১. **হযরত হাসান বস্‌রী (র)** (ওফাত ১১০ হিঃ) ঃ তাঁর ক্বেরাআতের চর্চা বসরাতে বেশী হয়েছে।

২. **মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন মাহীয** (ওফাত ১২৩ হিঃ) ঃ তাঁর ক্বেরাআতের কেন্দ্র ছিল মক্কা শরীফ।

৩. **ইয়াহ্ইয়া বিন মোবারক ইয়াযীদী** (ওফাত ২০২ হিঃ) ঃ ইনি বসরার অধিবাসী ছিলেন।

৪. **আবুল ফারজ শিনবুযী** (ওফাত ৩৮৮ হিঃ) ঃ ইনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন।

কেউ কেউ চৌদ্দজন ক্বারীর তালিকায় হযরত শিনবুযীর স্থলে সুলায়মান আ'মাশ-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

উপরিউক্ত চৌদ্দটি ক্বেরাআতের প্রথম দশটি সর্বসম্মত বহু বর্ণনা সমর্থিত। পরবর্তী চার জনের ক্বেরাআত বিরল বর্ণনাভিত্তিক—(মানাহেলুল-ইরফান, মুনজেদুল-মোকাররেঈন—ইবনুল জাযারী)।

কোরআন সংরক্ষণের ইতিহাস

রাসূল (সা)-এর আমলে

কোরআন শরীফ যেহেতু এক সাথে নাযিল হয়নি, বরং বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন-মত অল্প অল্প করে নাযিল করা হয়েছে, এজন্যে নবুওয়ত যুগে কোরআনকে গ্রন্থাকারে একত্রে লিপিবদ্ধ করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এজন্য প্রথম প্রথম কোরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে হেফয বা কন্ঠস্থ করার প্রতিই বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল। প্রথমাবস্থায় যখন ওহী নাযিল হতো তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওহীর শব্দগুলো সাথে সাথে দ্রুত আবৃত্তি করতে থাকতেন, যেন সেগুলো অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ক্বেয়ামায় আয়াত নাযিল হলো, যাতে আল্লাহ্ পাক তাঁকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, কোরআন কন্ঠস্থ করার জন্য ওহী নাযিল হতে থাকা অবস্থায় শব্দগুলো দ্রুত সাথে সাথে উচ্চারণ করে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তা'আলাই আপনার মধ্যে এমন তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি সৃষ্টি করে দেবেন যে, একবার ওহী নাযিল হওয়ার পর তা আর আপনি ভুলতে পারবেন না। তাই ওহী নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যেতো। এভাবেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সিনা কোরআনুল-করীমের এমন সুরক্ষিত ভাণ্ডারে পরিণত হয় যে, তন্মধ্যে সামান্যতম সংযোগ-বিয়োগ কিংবা ভুল-চুক হওয়ার কোন আশংকা ছিল না। এরপরও অধিকতর সাবধানতার খাতিরে প্রতি বছর রমযান মাসে তিনি সে পর্যন্ত নাযিলকৃত সমগ্র কোরআন হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তেলাওয়াত করে শোনাতেন, হযরত জিবরাঈল (আ)-এর নিকট থেকেও শুনে নিতেন। ওফাতের বছর রমযানে হুযুর দু'দুবার হযরত জিবরাঈল (আ)-কে শোনান এবং জিবরাঈল (আ) থেকে শোনেন। (বোখারী শরীফ)

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে প্রথমে কোরআনের আয়াতগুলো ইয়াদ করাতেন, তারপর আয়াতের মর্মার্থ শিক্ষা দিতেন। সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যেও কোরআন মুখস্থ করা এবং মর্মার্থ শিক্ষা করার এমন প্রবল আগ্রহ ছিল যে, প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে অন্যদের ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করতেন। অনেক মহিলা পর্যন্ত বিবাহের মোহরানা বাবদ এরূপ দাবী পেশ করতেন যে, স্বামীরা তাদেরকে শুধু কোরআন শরীফের তা'লীম দেবেন, এ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য হবে না। শত শত সাহাবী সব কিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে শুধুমাত্র কোরআনের তা'লীম গ্রহণ করার সাধনাতেই জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা কোরআন শরীফ শুধুমাত্র মুখস্থই করতেন না, নিয়মিত রাত জেগে নফল নামাযে তেলাওয়াতও করতেন। হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) বর্ণনা করেন যে, মক্কা থেকে কেউ হিজরত করে মদীনায় এলেই তাকে কোরআনের তা'লীম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে কোন একজন আনসারের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হতো। মসজিদে নববীতে সর্বক্ষণ কোরআন শিক্ষা দান ও তেলাওয়াতের শব্দ এমন বেড়ে গিয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ প্রদান করতে হয় যে, সবাই যেন আরো আস্তে কোরআন পাঠ করেন, যাতে পরস্পরের তেলাওয়াতের মধ্যে টক্কর না হয়। (মানাহেলুল-ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৪)

সীমাহীন আগ্রহ ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে খুব অল্প দিনেই সাহাবীগণের মধ্যে একদল হাফেযে-কোরআন তৈরী হয়ে গেলেন। এ জামায়াতের মধ্যে খোলাফায়ে-রাশেদীন বা প্রথম চার খলীফা ছাড়াও হযরত তালহা (রা), হযরত সা'আদ (রা), হযরত ইবনে মসউদ (রা), হযরত হোযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা), হযরত সালেম (রা), হযরত আবু হোরায়রা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), আমর ইবনুল-আস (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা), হযরত মুয়াবিয়া (রা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত হাফসা (রা), হযরত উম্মে-সালমা রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

মোটকথা, প্রাথমিক অবস্থায় কোরআন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে হেফয-এর প্রতিই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হতো। কারণ তখন লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। বই-পুস্তক প্রকাশের উপযোগী ছাপাখানা এপং অন্য কোন উপকরণের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং সে অবস্থায় যদি শুধু লেখার উপর নির্ভর করা হতো, তবে কোরআনের সংরক্ষণ যেমন জটিল সমস্যা হয়ে পড়তো, তেমনি ব্যাপক প্রচারের দিকটিও নিঃসন্দেহে অসম্ভব হয়ে যেতো। তাছাড়া আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল এমন প্রখর যে, এক এক ব্যক্তি হাজার হাজার কবিতা গাঁথা মুখস্থ করে রাখত। মরুভূমির বেদুঈনেরা পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে তাদের পরিবার ও গোত্রের কুষ্ঠিনামার ইতিহাস প্রভৃতি মুখস্থ করে রাখত এবং যত্রতত্র তা অনর্গল বলে যেতো। কোরআন হেফাযতের কাজে সেই অনন্য স্মৃতিশক্তিকেই কাজে লাগানো হয়েছে। হেফযের মাধ্যমেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র আরবের ঘরে ঘরে পবিত্র কোরআনের বাণী পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

ওহী লিপিবদ্ধকরণ

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোরআন পাক হেফয করানোর পাশাপাশি লিপিবদ্ধ করে রাখারও বিশেষ সুব্যবস্থা করেছিলেন। বিশিষ্ট কয়জন লেখাপড়া জানা সাহাবীকে এ দায়িত্বে নিয়োজিত করে রাখা হয়েছিল।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি ওহী লিখে রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। যখন তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হতো, তখন সর্ব শরীরে মুক্তার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিত। এ অবস্থা শেষ হওয়ার পর আমি দুম্বার চওড়া হাড় অথবা লিখন উপযোগী অন্য কোন কিছু নিয়ে হাযির হতাম। লেখা শেষ করার পর কোরআনের ওজন আমার শরীর পর্যন্ত এমন অনুভূত হতো যে, আমার পা ভেঙে পড়তো, মনে হতো আমি যেন চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছি!

লেখা শেষ হলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ যা লিখেছ আমাকে পড়ে শোনাও। আমি লিখিত অংশ পড়ে শোনাতাম। কোথাও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা শুদ্ধ করিয়ে দিতেন। এরপর সংশ্লিষ্ট অংশটুকু অন্যদের সামনে তেলাওয়াত করতেন। (মাজমাউয-যাওয়ায়েদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৬ ; তিবরানী)

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) ছাড়াও যাঁরা ওহী লিপিবদ্ধ করে রাখার দায়িত্ব পালন করতেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম চার খলীফা, হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম, হযরত মুয়াবিয়া, হযরত মুগীরা ইবনে শোবা, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ, হযরত সাবেত ইবনে কায়েস, হযরত আব্বাস ইবনে সায়ীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। (ফতহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮ ; যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০)

হযরত ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি কোন আয়াত নাযিল হওয়ার পর পরই ওহী লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত সাহাবীকে ডেকে সংশ্লিষ্ট আয়াতটি কোন্ সূরায় কোন্ আয়াতের পর সংযোজিত হবে তা বলে দিতেন এবং সেভাবেই তা লিপিবদ্ধ করা হতো। (ফতহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮)

সে যুগে আরবে যেহেতু কাগজ খুবই দুষ্প্রাপ্য ছিল, এজন্য কোরআনের আয়াত প্রধানত পাথর-শিলা, শুকনা চামড়া, খেজুর গাছের শাখা, বাঁশের টুকরা, গাছের পাতা এবং পশুর হাড়ের উপর লেখা হতো। কোন কোন সময় কেউ কেউ কাগজের টুকরা ব্যবহার করেছেন বলেও জানা যায়। (ফতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১)

লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে এমন একটি ছিল, যেটি স্বয়ং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিশেষ তত্ত্বাবধানে নিজের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। সেটি পরিপূর্ণভাবে কিতাব আকারে না হয়ে পাথর-শিলা, চামড়া প্রভৃতি সে যুগের প্রচলিত লেখন সামগ্রীর সমষ্টিরূপে রক্ষিত হয়েছিল। নিয়মিত লেখকগণ ছাড়াও সাহাবীগণের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কিছু কিছু আয়াত এবং সূরা লিখে রেখেছিলেন। ব্যক্তিগত লিখনের রেওয়াজ ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই প্রচলিত

ছিল। হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় তাঁর বোন ও ভগ্নিপতির হাতে কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতসম্বলিত একটি পাণ্ডুলিপি ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। (সীরাতে ইবনে হেশাম)

হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে চামড়া, হাড়, পাথর-শিলা, গাছের পাতা প্রভৃতিতে লিখিত কোরআন শরীফের নোসখা একত্র করে পরিপূর্ণ কিতাবের আকারে সংকলিত করার তাকিদ প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগেই অনুভূত হয়। সাহাবীগণ ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যেসব অনুলিপি তৈরী করেছিলেন, সেগুলো পূর্ণাঙ্গ ছিল না। অনেকেই আবার আয়াতের সাথে তফসীরও লিখে রেখেছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা) সবগুলো বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপি একত্র করে পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করত কোরআন পাককে একত্রে সংরক্ষিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

কি কারণে হযরত আবু বকর (রা) কোরআন শরীফের একখানা পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি তৈরী করে সংরক্ষিত করার আশু প্রয়োজনীয়তার কথা বেশী করে অনুভব করেছিলেন, সে সম্পর্কে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেন ঃ ইয়ামামার যুদ্ধের পর একদিন হযরত আবু বকর (রা) আমাকে জরুরী তলব দিলেন। আমি সেখানে পৌঁছে দেখি, হযরত ওমর (রা) সেখানে রয়েছেন। আমাকে দেখে হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ হযরত ওমর (রা) এসে আমাকে বলছেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফেযে-কোরআন শহীদ হয়ে গেছেন। এমনভাবে বিভিন্ন যুদ্ধে যদি হাফেয সাহাবীগণ শহীদ হতে থাকেন, তবে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয়, যখন কোরআনের কিছু অংশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। সে মতে আমার অভিমত হচ্ছে, অনতিবিলম্বে আপনি বিশেষ নির্দেশ প্রদান করে কোরআন শরীফ একত্রে সংকলিত করার ব্যবস্থা করুন।

আমি হযরত ওমর (রা)-কে বলেছি যে, যে কাজ হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম করেন নি, সে কাজ আমার পক্ষে করা সমীচীন হবে কিনা।

হযরত ওমর (রা) জবাব দিয়েছেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, এ কাজ হবে খুবই উত্তম। একথা তিনি বারবার বলতে থাকায় আমার মনও এ ব্যাপারে সায় দিচ্ছে। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "তুমি তীক্ষ্ণ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন উদ্যমী যুবক; তোমার সততা ও সাধুতা সম্পর্কে কারো কোন বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ নেই। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যমানায় তুমি ওহী লিপিবদ্ধ করার কাজ করেছ। সুতরাং তুমিই বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে কোরআনের বিক্ষিপ্ত সূরা ও আয়াতসমূহ একত্র করে লিখতে শুরু কর।"

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, এঁরা যদি আমাকে একটি পাহাড় স্থানান্তর করার নির্দেশ দিতেন, তবুও বোধ হয় তা আমার পক্ষে এতটুকু কঠিন বলে মনে হত না, যত কঠিন মনে হতে লাগলো পবিত্র কোরআন একত্রে লিপিবদ্ধ করার কাজটি। আমি নিবেদন করলাম ঃ আপনি কি করে সে কাজ করতে চান, যে কাজ

খোদ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম করেন নি। হযরত আবু বকর (রা) জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, এ কাজ খুবই উত্তম হবে। বারবার তিনি আমাকে একই কথা বলতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা এ কাজের যথার্থতা সম্পর্কে আমার মনেও প্রত্যয় সৃষ্টি করে দিলেন। এরপর থেকেই আমি খেজুরের ডাল, পাথর, হাড়, চামড়া প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন সূরা ও আয়াত একত্র করতে শুরু করলাম। লোক-জনের স্মৃতিতে সংরক্ষিত কোরআনের সাথে যাচাই করে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করার কাজ সমাপ্ত করলাম। (সহীহ্ বোখারী, কিতাবু ফাযায়েলিল কোরআন)

প্রসঙ্গত এখানে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) কর্তৃক কোরআন শরীফ একত্রে সংকলন করার ব্যাপারে গৃহীত কার্যক্রমটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি নিজেও হাফেযে-কোরআন ছিলেন। সুতরাং নিজের স্মৃতি থেকেই সম্পূর্ণ কোরআন লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ ছিলেন। তা'ছাড়া শত শত হাফেয বর্তমান ছিলেন। তাঁদের একত্র করেও সমগ্র কোরআন একত্রে লিপিবদ্ধ করা সহজ ছিল, বিশেষত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তত্ত্বাবধানে যে পাণ্ডুলিপিটি তৈরী হয়েছিল, সেটি থেকেও তিনি নকল করে নিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে সবগুলো উপকরণ একত্র করেই এ কাজ সম্পাদন করেন। প্রতিটি আয়াতের ক্ষেত্রেই তিনি নিজের স্মৃতি, লিখিত দলীল, অন্যান্য হাফেযের তেলাওয়াত প্রভৃতি সবগুলোর সাথে যাচাই করে সর্বসম্মত বর্ণনার ভিত্তিতেই তাঁর পাণ্ডুলিপি লিপিবদ্ধ করেছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেসব লোককে দিয়ে ওহী লিপিবদ্ধ করাতেন, সাধারণ ঘোষণা প্রচার করে সে সবগুলো নোস্‌খা একত্র করার ব্যবস্থা করেন। যেসব লিখিত দলীল সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক হযরত যায়েদ (রা)-এর নিকট হাযির করা হল, সেগুলো যাচাই করার জন্য নিম্নোক্ত চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করলেন ঃ

১. সর্বপ্রথম তিনি তাঁর স্মৃতিতে রক্ষিত কোরআনের সাথে সেগুলো যাচাই করতেন।

২. হযরত ওমর (রা)-ও হাফেযে কোরআন ছিলেন। হযবত আবু বকর তাঁকেও হযরত যায়েদ (রা)-এর সঙ্গে এ কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁরা যৌথভাবেই লিখিত নোসখাগুলো গ্রহণ করতেন এবং একজনের পর অন্যজন স্ব স্ব স্মৃতির সঙ্গে যাচাই করতেন। (ফতহুল বারী, আবু দাউদ)

৩. এমন কোন লিখিত আয়াতই গ্রহণ করা হতো না, যে পর্যন্ত অন্তত দু'জন বিশ্বস্ত সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য না দিতেন যে, এগুলো খোদ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। (ইতক্বান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০)

৪. অতঃপর লিখিত আয়াতগুলো অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক লিখিত পাণ্ডুলিপির সাথে সুষ্ঠুভাবে যাচাই করে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত করা হতো।—(আল-বেরহানা, ফী উলুমিল-কোরআন, যারাকশী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৮)

হযরত আবু বকরের যমানায় কোরআন সংকলন করার ব্যাপারে অবলম্বিত উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলো উত্তমরূপে অনুধাবন করার পরই হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর কথাটির অর্থ পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, সূরা বারাআত-এর শেষ আয়াত—

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ

থেকে শেষ পর্যন্ত অংশটি শুধু হযরত আবু খুযায়মা (রা)-র কাছে পাওয়া যায়। এ কথার অর্থ এ নয় যে, এ আয়াত কয়টি শুধু সাহাবী হযরত আবু খুযায়মা (রা)-ই জানতেন, অন্য কেউ জানতেন না কিংবা অন্য কারো স্মৃতিতে ছিল না অথবা অন্য কারো কাছে লিখিত আকারে ছিল না বরং এ কথার অর্থ এই যে, খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তত্ত্বাবধানের লিখিত দলীল হিসাবে এবং উপরিউক্ত চার শর্তে উত্তীর্ণ এ অংশটুকু কেবলমাত্র আবু খুযায়মা (রা)-ই পেশ করেছিলেন। অন্যথায় শত শত হাফেজের স্মৃতিতে ও লিখিত পূর্ণ কোরআনের নোস্‌খায় এ কয়টি আয়াতও অবশ্যই ছিল। শুধু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যমানায় ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য পৃথকভাবে লিখিত এ আয়াত আবু খুযায়মা (রা)-ই পেশ করেছিলেন। (আল্ বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৪-২৩৫)

মোটকথা, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) অসাধারণ সাবধানতার সাথে কোরআন শরীফের পরিপূর্ণ নোসখা তৈরী করে ধারাবাহিকভাবে কাগজে লিপিবদ্ধ করেন। (আল-এতক্বান, ১ম খণ্ড, ৬০ পৃষ্ঠা)

কিন্তু যেহেতু প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক করে লেখা হয়েছিল, এজন্য সেইটি অনেকগুলো 'সহীফায়' বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তখনকার পরিভাষায় এ সহীফাগুলোকে 'উম্ম' বা মূল পাণ্ডুলিপি বলে আখ্যায়িত করা হতো। এ পাণ্ডুলিপির বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ

১. আয়াতগুলো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত ধারায় লিপিবদ্ধ করা হলেও সূরাগুলোর ধারাবাহিকতা ছিল না। প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক লিখিত হয়েছিল। (আল্-এতক্বান)

২. এ নোস্‌খায় পূর্ববর্ণিত কোরআনের সাতটি ক্বেরাআতই সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। (মানাহেলুল-এরফান, তারীখুল-কোরআন,—কুর্দী)

৩. যে সব আয়াতের তেলাওয়াত প্রচলিত ছিল সবগুলো আয়াতই এতে ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

৪. নোস্‌খাটি এ উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছিল, যেন প্রয়োজনবোধে উম্মতের সবাই এইটি থেকে নিজ নিজ নোস্‌খা শুদ্ধ করে নিতে পারেন।

হযরত আবু বকর (রা)-এর উদ্যোগে সংকলিত এ নোস্‌খাটি তাঁর কাছেই রক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর এটি হযরত ওমর (রা) নিজের হেফাযতে নিয়ে নেন। হযরত ওমর (রা)-এর শাহাদতের পর নোস্‌খাটি উম্মুল-মু'মেনীন হযরত হাফসা (রা)-র কাছে রক্ষিত থাকে। শেষ পর্যন্ত হযরত ওসমান (রা) কর্তৃক সূরার তরতীব অনুসারে লিখন পদ্ধতিসহ

কোরআনের সর্বসম্মত শুদ্ধতম নোস্‌খা প্রস্তুত হয়ে চারদিকে বিতরিত হওয়ার পর হযরত হাফসা (রা)-র নিকট রক্ষিত নোস্‌খাটি নষ্ট করে ফেলা হয়। কেননা তখন সর্বসম্মত লিখন-পদ্ধতি ও সূরার তরতীববিহীন কোন নোস্‌খা অবশিষ্ট থাকলে সর্বসাধারণের পক্ষে বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়ার আশংকা ছিল বলেই এরূপ করা হয়েছিল। (ফতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬)

হযরত ওসমান (রা)-এর আমলে

হযরত ওসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর ইসলাম আরবের সীমান্ত অতিক্রম করে ইরান ও রোমের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি নতুন এলাকার লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর যেসব মুজাহিদ কিংবা বণিকের মাধ্যমে তারা ইসলামের দওলত লাভ করেন, তাঁদের নিকটই কোরআন শরীফ শিক্ষা করতেন। ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন শরীফ সাত হরফ বা ক্বেরাআতে নাযিল হয়েছিল। সাহাবীগণও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে বিভিন্ন ক্বেরাআতেই কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষা করেছিলেন। সে জন্য প্রত্যেক সাহাবীই যে ক্বেরাআতে শিক্ষা করেছিলেন সে ক্বেরাআতেই স্ব স্ব সাগরেদগণকে কোরআন শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। এ ভাবেই বিভিন্ন ক্বেরাআত পদ্ধতিও বহু দূরদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। যেসব এলাকার লোকেরা এ তথ্য অবগত ছিলেন যে, কোরআন শরীফ সাত ক্বেরাআত পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে, সে সব এলাকায় কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু দূর-দূরান্তের লোকদের কাছে কোরআনের বিভিন্ন ক্বেরাআত ইত্যাদি সম্পর্কিত পূর্ণ তথ্য ও জ্ঞানের অপ্রতুলতা হেতু কোথাও কোথাও ক্বেরাআতের পার্থক্যকে কেন্দ্র করে নানা মতভেদ এমন কি ঝগড়া-বিবাদ পর্যন্ত হতে আরম্ভ করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্বেরাআত পদ্ধতিকে শুদ্ধ এবং অন্যদের ক্বেরাআতকে ভুল বলে চিহ্নিত করতে শুরু করে। ফলে ভুল বুঝাবুঝি শুরু হয় এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে বহুল সমর্থিত, নিঃসন্দেহ বর্ণনা-সূত্রে প্রাপ্ত, ক্বেরাআত রীতিকে ভুল অভিহিত করার গোনাহ থেকে মানুষকে রক্ষা এবং পারস্পরিক মতবিরোধের আশু একটা নির্ভরযোগ্য সমাধান অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তখন পর্যন্ত মদীনা শরীফে রক্ষিত হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা) কর্তৃক লিখিত নোস্‌খা ব্যতীত অন্য কারো নিকট এমন কোন নোস্‌খা ছিল না, যা অভ্রান্ত দলীলরূপে দাঁড় করানো যেতে পারে। কেননা অন্য যেসব নোস্‌খা ছিল সেগুলো যেহেতু ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরী হয়েছিল, সুতরাং সেগুলোর লেখন পদ্ধতিতে সবগুলো শুদ্ধ ক্বেরাআত উল্লিখিত থাকত না। এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা ছিল এই যে, এমন এক লিপি-পদ্ধতির মাধ্যমে কোরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করে সমগ্র মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে দেওয়া, যার মাধ্যমে সাত ক্বেরাআতেরই তেলাওয়াত সম্ভব হয় এবং ক্বেরাআতের ক্ষেত্রে কোন মতভেদ দেখা দিলে সে নোস্‌খা দেখে মীমাংসা করে নেওয়া যায়। হযরত ওসমান (রা) তাঁর খেলাফতের যমানায় এই গুরুত্বপূর্ণ বিরাট কাজটিই সম্পাদন করে গেছেন।

এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করার যে পটভূমি হাদীসগ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) আর্মেনিয়া ও আযারবাইজান এলাকায় জেহাদে নিয়োজিত হন। সেখানে তিনি লক্ষ্য করেন যে, কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরনের মতভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। তখন মদীনায় ফিরে এসেই তিনি সোজা হযরত ওসমান (রা)-এর দরবারে হাযির হলেন এবং নিবেদন করলেন ঃ আমীরুল মু'মেনীন ! এ উম্মত আল্লাহ্র কিতাবের ব্যাপারে ইহুদী-নাসারাদের ন্যায় মত-ভেদের শিকারে পরিণত হওয়ার আগেই আপনি এর একটা সুষ্ঠু প্রতিবিধানের ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

হযরত ওসমান (রা) বিষয়টি খুলে বলতে বললেন। হযরত হুযায়ফা (রা) বললেন ঃ আমি আর্মেনিয়া এলাকায় জেহাদে লিপ্ত থাকা অবস্থায় লক্ষ্য করেছি, সিরিয়া এলাকার লোকেরা হযরত উবাই ইবনে কা'ব-এর ক্বেরাআত-পদ্ধতি অনুসরণে কোরআন তেলাওয়াত করছে। অপরপক্ষে ইরাকের লোকেরা আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের ক্বেরাআত-পদ্ধতি অনুসরণ করছে। যেহেতু সিরিয়ার লোকেরা ইবনে মসউদের ক্বেরাআত-পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় এবং ইরাকের লোকদের পক্ষেও উবাই ইবনে কা'বের ক্বেরাআত-পদ্ধতি শোনার সুযোগ হয়নি। ফলে এঁদের মধ্যে তেলাওয়াতের ব্যাপারে এমন মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত একে অন্যকে কাফের আখ্যায়িত করার পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছে।

হযরত ওসমান (রা) নিজেও এরূপ একটা বিপদের আশংকা করছিলেন। খোদ মদীনা শরীফেও বিভিন্ন ওস্তাদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত সাগরেদগণের মধ্যে ক্বেরাআতের পার্থক্যকে ভিত্তি করে বেশ উত্তপ্ত মতবিরোধ সৃষ্টি হচ্ছিল। অনেক ক্ষেত্রে এ মত-বিরোধের উত্তাপ ওস্তাদগণের কাতারে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে যাচ্ছিল। এমন কি তাঁরাও একে অপরের ক্বেরাআতকে ভুল বলতে শুরু করেছিলেন।

হযরত হুযায়ফা ইবনুল-ইয়ামান (রা) কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর হযরত ওসমান (রা) এ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট সাহাবীগণকে একত্র করলেন। সকলকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আমি শুনতে পেয়েছি যে, এক শ্রেণীর লোক অন্যদেরকে লক্ষ্য করে বলছে যে, আমাদের ক্বেরাআত তোমাদের চাইতে উত্তম এবং সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ। অথচ এ ধরনের মন্তব্য কুফরীর পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। সুতরাং এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আপনারা কি পরামর্শ দেন?

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি এ সম্পর্কে কি চিন্তা করেছেন? হযরত ওসমান (রা) বললেন, আমার অভিমত হচ্ছে, সকল শুদ্ধ বর্ণনা একত্র করে এমন একটা সর্ব-সম্মত নোস্খা তৈরী করা কর্তব্য, যাতে ক্বেরাআত-পদ্ধতির মধ্যেও কোন মতভেদের অবকাশ না থাকে। সাহাবীগণ সর্বসম্মতিক্রমে হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত সমর্থন করলেন এবং এ ব্যাপারে সর্বতোভাবে সহযোগিতা প্রদান করার অঙ্গীকার করলেন।

এরপর হযরত ওসমান (রা) সর্বশ্রেণীর লোককে সমবেত করে একটি জরুরী খোতবা

দিলেন। তাতে তিনি বললেন ঃ আপনারা মদীনা শরীফে আমার অতি নিকটে বসবাস করেও কোরআন শরীফের ব্যাপারে একে অন্যকে দোষারোপ ও মতভেদ করছেন। এতেই বোঝা যায় যে, যাঁরা আমার থেকে দূর থেকে দূরতর এলাকায় বসবাস করেন, তাঁরা এ ব্যাপারে আরো বেশী মতভেদ এবং ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত হয়েছেন। সুতরাং আসুন, আমরা সকলে মিলে কোরআন শরীফের এমন একটা লিখিত নোস্‌খা তৈরী করি, যাতে মতভেদের কোন সুযোগ থাকবে না এবং সবার পক্ষেই সেটি অনুসরণ করা অপরিহার্য কর্তব্য বলে গণ্য হবে।

এ উদ্দেশ্যে হযরত ওসমান (রা) সর্ব প্রথম উম্মুল-মু'মেনীন হযরত হাফসা (রা)-র কাছ থেকে হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক লিপিবদ্ধ 'মাস্‌হাফগুলো' চেয়ে আনলেন। এ মাস-হাফ সামনে রেখে সূরার তরতীবসহ কোরআনের শুদ্ধতম 'মাসহাফ' তৈরী করার উদ্দেশ্যে কোরআন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত চারজন মশহুর সাহাবী হযরত যায়েদ বিন সাবেত, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের, হযরত সায়ীদ ইবনুল-আস ও হযরত আবদুর রহমান বিন হারেস বিন হিশাম (রা) সমন্বয়ে গঠিত এক জামাতের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁদের প্রতি নির্দেশ ছিল হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক সংকলিত মাস্‌হাফকেই শুধুমাত্র এমন একটা সর্বসম্মত লিখন-পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা, যে লিপির সাহায্যে প্রতিটি শুদ্ধ ক্বেরাআত-পদ্ধতি অনুযায়ীই তেলাওয়াত করা সম্ভব হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত চারজন সাহাবীর মধ্যে হযরত যায়েদ ছিলেন আনসারী (রা) এবং অবশিষ্ট তিনজন কোরাইশ। হযরত ওসমান (রা) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যদি লিখন-পদ্ধতির ব্যাপারে হযরত যায়েদ (রা)-এর সাথে অন্য তিনজনের মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে কোরাইশদের লিপি-পদ্ধতি অনুসরণ করবে। কারণ কোরআন যাঁর প্রতি নাযিল হয়েছিল, তিনি নিজে কোরাইশ ছিলেন। কোরাইশদের ব্যবহৃত ভাষাই কোরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে চারজন সাহাবীকে লেখার দায়িত্ব অর্পণ করা হলেও অন্যান্য অনেক-কেই তাঁদের সাথে সাহায্যকারী হিসাবে যুক্ত করা হয়েছিল। তাঁরা কোরআন লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে নিম্নোক্ত কাজগুলো সম্পাদন করেন ঃ

এক. হযরত আবুবকর (রা)-এর উদ্যোগে লিখিত যে নোস্‌খাটি তৈরী করা হয়েছিল, তাতে সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে না সাজিয়ে প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক নোস্‌খায় লিখিত হয়েছিল। তাঁরা সবগুলো সূরাকে ক্রমানুপাতে একই 'মাসহাফ'-এ সাজিয়ে দেন। (মুস্‌তাদরাক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৯)

দুই. আয়াতগুলো এমন এক লিখন-পদ্ধতি অনুসরণে লেখা হয়, যাতে সবগুলো শুদ্ধ ক্বেরাআত-পদ্ধতিতেই তা পাঠ করা যায়। এ কারণেই অক্ষরগুলোর মধ্যে নোক্‌তা এবং যের-যবর-পেশ সংযুক্ত হয়নি। (মানাহেলুল-এরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৪)।

তিন. তখন পর্যন্ত কোরআনের সর্বসম্মত এবং নির্ভরযোগ্য একটি মাত্র নোস্‌খা মওজুদ ছিল। তাঁরা একাধিক নোস্‌খা তৈরী করেন। সাধারণ বর্ণনামতে হযরত ওসমান

(রা) পাঁচখানা নোস্‌খা তৈরী করেছিলেন। কিন্তু আবু হাতেম সাজেস্তানী (রা)-র মতে সাতটি নোস্‌খা তৈরী হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে একটি মক্কা শরীফে, একটি সিরিয়ায়, একটি ইয়ামানে, একটি বাহরাইনে, একটি বসরায় এবং একটি কুফায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অবশিষ্ট একটি নোস্‌খা বিশেষ যত্ন সহকারে মদীনা শরীফে সংরক্ষিত হয়েছিল। (ফতহুল-বারী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭)

চার. লেখার ব্যাপারে তাঁরা প্রধানত হযরত আবু বকর (রা)-এর যামানায় লিখিত নোস্‌খা অনুসরণের সাথে অধিকতর সাবধানতাবশত ঐ সমস্ত পদ্ধতিও অনুসরণ করেন, হযরত আবু বকর (রা)-এর যমানায় মূল পাণ্ডুলিপি তৈরী করার সময় যা অনুসৃত হয়েছিল, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যমানায় লিখিত যে সমস্ত অনুলিপি সাহাবীগণের নিকট সংরক্ষিত ছিল, সেগুলোও পুনরায় একত্র করা হয়। মূল অনুলিপির সাথে সেসব অনুলিপিও নতুনভাবে যাচাই করে দেখা হয়। সাহাবীগণের নিকট যেসব অনুলিপি ছিল, তন্মধ্যে সূরা আহযাব-এর এ আয়াত ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

শুধুমাত্র হযরত খুযায়মা বিন সাবেত আনসারী (রা)-র নোস্‌খায় লিখিত পাওয়া গিয়েছিল। এর অর্থ এ নয় যে, এ আয়াত অন্য কারো স্মরণ ছিল না কিংবা হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক সংকলিত অনুলিপিতে লিখিত ছিল না। কেননা, হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা) বর্ণনা করেন যে, মাসহাফ তৈরী করার সময় সূরা আহযাবের সে আয়াতটি বিচ্ছিন্ন কোন নোস্‌খাতেই পাওয়া যাচ্ছিল না, যেটি আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অনেকবার তেলাওয়াত করতে শুনেছি। এ বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এ আয়াত হযরত যায়েদ (রা)-সহ অনেক সাহাবীরই স্মরণ ছিল কিংবা এত-দ্বারা একথাও বোঝায় না যে, এ আয়াত অন্য কোন লিপিতেও ছিল না। বরং হযরত আবু বকর কর্তৃক তৈরী করা নোস্‌খায় এ আয়াত লিখিত ছিল। বিচ্ছিন্ন নোস্‌খা-গুলো মূলের সাথে যাচাই করার সময় খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যমানায় সাহাবীগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগে যেসব নোস্‌খা লিখিত হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে এ আয়াত কেবলমাত্র হযরত খুযায়মা বিন সাবেত (রা)-এর লিখিত নোস্‌খাতে পাওয়া গিয়েছিল।

পাঁচ. কোরআন পাকের এ সর্বসম্মত মাসহাফ তৈরী হওয়ার পর সমগ্র উম্মত এ মাসহাফ-এর ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর হযরত ওসমান (রা) আগেকার বিক্ষিপ্ত সকল নোস্‌খা আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করে দেন। কেননা এরপরও ব্যক্তিগত ও অবিন্যস্তভাবে লিখিত নোস্‌খাগুলো অবশিষ্ট থাকতে দিলে সূরার ক্রমানুপাতিক গ্রন্থনা এবং সর্বসম্মত প্রতিটি ক্বেরাআতে পাঠোপযোগী লিখন-পদ্ধতির ব্যাপারে ঐকমত্য সৃষ্ট হওয়ার পরও পুনরায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা অবশিষ্ট থেকে যেতো।

হযরত ওসমান (রা)-এর এ কাজকে সমগ্র উম্মত প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতভাবে এ কাজ সমাপ্ত করার ব্যাপারে তাঁকে সমর্থন ও সহ-

যোগিতা প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা)-এর মন্তব্য, "ওসমান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ভাল ছাড়া কিছু বলো না। কেননা আল্লাহ্‌র কসম! তিনি কোরআনের 'মাসহাফ' তৈরীর ব্যাপারে যা কিছু করেছেন, তা আমাদের সামনে আমাদের পরামর্শেই করেছেন।" (ফতহুল-বারী, ৯ম খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা)

তেলাওয়াত সহজ করার প্রচেষ্টা

হযরত ওসমান (রা) কর্তৃক 'মাসহাফ' তৈরীর কাজ চূড়ান্ত হওয়ার পর সমগ্র উম্মত ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, হযরত ওসমান (রা) অনুসৃত লিখন পদ্ধতি ব্যতীত কোরআন শরীফ অন্য কোন পদ্ধতি অনুসরণে লিপিবদ্ধ করা জায়েয নয়। ফলে পরবর্তীতে সমস্ত 'মাসহাফ'ই হযরত ওসমান (রা)-এর লিখন পদ্ধতি অনুসরণে লিখিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ হযরত ওসমান (রা)-এর তৈরী করা মাসহাফ-এর অনুলিপি তৈরী করেই দুনিয়ার সর্বত্র কোরআন -করীম ব্যাপকভাবে প্রচার করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু যেহেতু মূল ওসমানী অনুলিপিতে নোক্‌তা ও যের-যবর-পেশ ছিল না, সেজন্য অনরাবদের পক্ষে এ মাসহাফ-এর তেলাওয়াত অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর ছিল। ইসলাম দ্রুত আরবের বাইরে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে 'ওসমানী' অনুলিপিতে নোক্‌তা ও যের-যবর-পেশ সংযোজন করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হতে শুরু করে। সর্বসাধারণের জন্য তেলাওয়াত সহজতর করার লক্ষ্যে মূল ওসমানী 'মাসহাফ'-এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়। সংক্ষেপে প্রক্রিয়াগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

নোক্‌তা

প্রাচীন আরবদের মধ্যে হরফে নোক্‌তা সংযোজন করার রীতি প্রচলিত ছিল না। বস্তুত তখনকার দিনের লোকদের পক্ষে নোক্‌তাবিহীন লিপি পাঠ করার ব্যাপারে কোন অসুবিধাও হতো না। প্রসঙ্গ ও চিহ্ন দেখেই তাঁরা বাক্যের পাঠোদ্ধার করতে অভ্যস্ত ছিলেন। কোরআন শরীফের ব্যাপারে আদৌ কোন অসুবিধার আশংকা এজন্য ছিল না যে, কোরআন তেলওয়াতে মোটেও অনুলিপিনির্ভর ছিল না। হাফেযগণের তেলাওয়াত থেকেই লোকেরা তেলাওয়াত শিক্ষা করতেন। হযরত ওসমান (রা) মুসলিম জাহানের বিভিন্ন এলাকায় কোরআনের 'মাসহাফ' প্রেরণ করার সময় সাথে বিশিষ্ট তেলাওয়াতকারী হাফেযও প্রেরণ করেছিলেন, যেন লোকজনকে মাসহাফের পাঠোদ্ধারের ব্যাপারে তাঁরা পথপ্রদর্শন করতে পারেন।

কোরআন -করীমের হরফসমূহে সর্বপ্রথম নোক্‌তার প্রচলন, কে করেছিলেন, এ সম্পর্কিত বর্ণনায় মতভেদ দেখা যায়। কোন কোন বর্ণনাকরীর মতে এ কাজ বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ তাবেয়ী হযরত আবুল-আসওয়াদ দোয়ালী (রা) আনজাম দেন। (আল্‌-বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫০)

অনেকের মতে আবুল-আসওয়াদ দোয়ালী এ কাজ হযরত আলী (রা)-র নির্দেশে আনজাম দিয়েছিলেন। (সুবহুল-আ'শা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৫)।

কারো কারো মতে কুফার শাসনকর্তা যিয়াদ ইবনে সুফিয়ান আবুল-আসওয়াদকে দিয়ে এ কাজ করিয়েছিলেন। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত

হাসান বসরী (র), হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়ামা'র (র) ও হযরত নসর ইবনে আসেম লাইসী (র)-র দ্বারা এ কাজ করিয়েছিলেন। (তফসীরে-কুরতুবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬)

হরকত

নোকতার ন্যায় প্রথম অবস্থায় কোরআন শরীফে হরকত বা যের-যবর-পেশ ইত্যাদিও ছিল না। সর্বপ্রথম কে হরকত-এর প্রবর্তন করলেন এ ব্যাপারেও বিরাট মতপার্থক্য রয়েছে। কারো কারো মতে সর্বপ্রথম হযরত আবুল-আসওয়াদ দোয়ালী হরকত প্রবর্তন করেন। আবার অনেকেরই অভিমত হচ্ছে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়ামার ও নসর ইবনে আসেম লাইসীর দ্বারা একাজ করিয়েছিলেন। (কুরতুবী, ১ম খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা)

এ সম্পর্কিত সবগুলো বর্ণনা একত্র করে বিষয়টি আনুপূর্বিক পর্যালোচনা করলে অনুমিত হয় যে, কোরআন শরীফের জন্য হরকত সর্বপ্রথম হযরত আবুল-আসওয়াদ দোয়ালীই আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত হরকতসমূহ আজকাল প্রচলিত হরকতের মত ছিল না। বরং যবর দিতে হলে হরফের উপরিভাগে একটা নোক্তা এবং যের দিতে হলে নীচে একটা নোক্তা বসিয়ে দেওয়া হতো। অনুরূপ পেশ-এর উচ্চারণ করার জন্য হরফের সামনে একটা নোক্তা ও তানবীন-এর জন্য দু'টি নোক্তা ব্যবহার করা হতো। আরো কিছুকাল পরে খলীল ইবনে আহমদ (র) হামযা ও তাশ-দীদের চিহ্ন তৈরী করেন। (সুবহুল-আ'শা ৩য় খণ্ড, ১৬০ ও পৃষ্ঠা ১৬১)

এরপর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ উদ্যোগী হয়ে হযরত হাসান বসরী (র), ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়া'মার ও নসর ইবনে আ'সেম লাইসী প্রমুখকে কোরআন শরীফে নোকতা ও হরকত প্রদানের জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। হরকতগুলোকে আরো সহজবোধ্য করার জন্য উপরে, নিচে বা পাশে অতিরিক্ত বিন্দু ব্যবহার করার হযরত আবুল আস-ওয়াদ প্রবর্তিত পদ্ধতির স্থলে বর্তমান আকারের হরকতের প্রবর্তন করা হয়, যেন হরফের নোকতার সঙ্গে হরকতের নোকতার সংমিশ্রণে জটিলতার সৃষ্টি না হয়।

মন্যিল

সাহাবায়ে-কেরাম ও তাবেয়ীগণের অনেকেই সপ্তাহে অন্তত এক খতম কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন। এজন্য তাঁরা দৈনিক তেলাওয়াতের একটা পরিমাণ নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। সে পরিমাণকেই 'হেযব' বা মন্যিল বলা হতো। এ কারণেই কোর-আন শরীফ সাত মন্যিলে বিভক্ত হয়েছে। (আল্-বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫০)।

পারা

কোরআন শরীফ সমান ত্রিশটি খণ্ডে বিভক্ত। এ খণ্ডগুলোকে 'পারা' বলে অভিহিত করা হয়। পারার এ বিভক্তি অর্থ বা বিষয়বস্তুভিত্তিক নয় বরং পাঠ করার সুবিধার্থে সমান ত্রিশটি খণ্ড করে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা অনেক সময় দেখা যায়, কোন একটা প্রসঙ্গের মাঝখানেই এক পারা শেষ হয়ে নতুন পারা আরম্ভ হয়ে গেছে।

ত্রিশ পারায় বিভক্তি কার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, সে তথ্য উদ্ধার করা কঠিন। অনেকের ধারণা হযরত ওসমান (রা) যখন কোরআন শরীফের অনুলিপি তৈরী করেন, তখন এ

ধরনের ত্রিশটি খণ্ডে তা লিখিত হয়েছিল এবং তা থেকেই ত্রিশ পারার প্রচলন হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী যুগের কোন নির্ভরযোগ্য আলেমের কিতাবেই আমরা এ তথ্যের সমর্থন পাইনি। আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী (র) লেখেন, কোরআনের ত্রিশ পারা বহু আগে থেকেই চলে আসছে বিশেষত মাদ্রাসায় শিশুদেরকে শিক্ষা দানের ক্ষেত্রেই এ ত্রিশ পারার রেওয়াজ বেশী চলে আসছে। (আল্-বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫০; মানাহেলুল এরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০২)

মনে হয়, ত্রিশ পারার এ বিভক্তি সাহাবায়ে-কেরামের যুগের পর শিক্ষাদান কার্যে সুবিধার জন্য করা হয়েছে।

আখমাস ও আশার

প্রাথমিক যুগের লিখিত কোরআন শরীফের নোসখায় আরো দুটি আলামত দেখা যেত। প্রতি পাঁচ আয়াতের পর পাতার পাশে خمس অথবা সংক্ষেপে শুধু خ হরফটি লেখা থাকত। অনুরূপ দশ আয়াতের পর عشر অথবা ع সংক্ষেপে লিখিত হতো। প্রথম চিহ্নটিকে 'আখমাস' এবং পরবর্তী চিহ্নটিকে আ'শার বলা হতো। (মানাহেলুল এরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৩)

কোরআন শরীফে এ ধরনের চিহ্ন ব্যবহার জায়েয কিনা, এ সম্পর্কেও পূর্ববর্তী আলেমগণের মধ্যে মতবিরোধ হতে দেখা গেছে। কেউ কেউ এ ধরনের চিহ্ন ব্যবহার জায়েয এবং অনেকেই মকরূহ বলেছেন। সঠিকভাবে একথা বলাও মুশকিল যে, সর্বপ্রথম এ আলামতের প্রচলন কে করেছিলেন। কারো কারো মতে এ চিহ্ন ব্যবহারের প্রবর্তনকারী ছিলেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এবং অন্য অনেকের মতে আব্বাসীয় বংশের খলীফা মামুন এ চিহ্নের প্রবর্তন করেছিলেন। (আল্-বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫১)

কিন্তু উপরিউক্ত দু'টি অভিমতই এজন্য শুদ্ধ বলে মনে হয় না যে, সাহাবায়ে কেরামের যুগেও আখমাস ও আ'শার-এর চিহ্ন পাওয়া যায়। হযরত মসরুক-এর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) মাসহাফের মধ্যে আ'শার-এর চিহ্ন সংযোজন করা মকরূহ মনে করতেন। (ইবনে আবি শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৩)।

রুকু

'আখমাস' ও 'আ'শার'-এর আলামত পরবর্তী পর্যায়ে পরিত্যক্ত হয়ে অন্য একটা আলামতের ব্যবহার প্রচলিত হয়। বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রচলিত এ চিহ্নটিকে রুকু বলা হয়। এ চিহ্নটি আয়াতে আলোচিত বিষয়বস্তুর অনুসরণে নির্ধারণ করা হয়েছে। একটা প্রসঙ্গ যেখানে এসে শেষ হয়েছে, সেখানে পৃষ্ঠার পাশে রুকুর চিহ্নস্বরূপ একটা ع অক্ষর অংকিত করা হয়।

এ চিহ্নটি কখন কার দ্বারা প্রচলিত হয়েছে, অনেক তালাশ করেও এ সম্পর্কিত কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হইনি। তবে বোঝা যায় যে, এ চিহ্ন দ্বারা আয়াতের এমন একটা মোটামুটি পরিমাণ নির্ধারণ করা উদ্দেশ্য, যেটুকু সাধারণত নামাযের এক রাকাআতে পঠিত হতে পারে। নামাযে এতটুকু তেলাওয়াত করে রুকু করা যেতে পারে, এদিকে লক্ষ্য রেখেই বোধ হয় একে রুকু বলা হয়।

সমগ্র কোরআন শরীফে ৫৪০টি রুকূ রয়েছে। যদি তারাবীহ্‌র নামাযে প্রতি রাকআতে এক রুকূ করে পড়া হয় তবে সাতাশে রাতে কোরআন খতম হয়ে যায়। (ফতাওয়ায়ে-আলমগিরী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৪, তারাবীহ অধ্যায়)

কয়েকটি যতিচিহ্ন

শুদ্ধ তেলাওয়াতের সুবিধার্থে আয়াতের মধ্যে কয়েক প্রকারের যতিচিহ্নের প্রচলন করা হয়েছে। এ চিহ্নগুলোর দ্বারা কোথায় থামতে হবে, কোন্ জায়গায় কিছুটা শ্বাস নেওয়া যাবে, এ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী জানা যায়। এ চিহ্নগুলোকে পরিভাষায় 'রুমূযে-আওক্বাফ' বলা হয়। এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, একজন আরবী না-জানা লোকও যেন সহজে বুঝতে পারেন, কোথায় কতটুকু থামতে হবে ; কোন্‌খানে থামলে পর অর্থের বিকৃতি ঘটতে পারে। এ চিহ্নগুলোর অধিকাংশ আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে তাইফুর সাজাওয়ান্দী কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল। (আন্-নশ্‌রু ফী ক্বেরা'আতিল-আশ্‌র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৫)

চিহ্নগুলো নিম্নরূপ ঃ

ط = 'ওয়াকফ মতলক্ব' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ বাক্য পূর্ণ হয়ে গেছে। এখানে থামাটাই উত্তম।

ج = 'ওয়াকফ-জায়েয' শব্দের সংক্ষেপ। অর্থ এখানে থামা যেতে পারে।

ز = 'ওয়াকফ-মুজাওয়ায'-এর সংক্ষেপ। অর্থ এখানে থামা যেতে পারে, তবে না থামাই উত্তম।

ص = 'ওয়াকফ-মুরাখ্‌খাছ'-এর সংক্ষেপ। অর্থ এখানে আয়াত শেষ হয়নি! তবে বাক্য যেহেতু দীর্ঘ হয়ে গেছে, তাই যদি দম নেওয়ার জন্য থামতে হয়, তবে এখানেই থামা উচিত। (আল-মানুহুল-ফিকরিয়্যা, পৃষ্ঠা ৬৩)

م = 'ওয়াকফ-লাযেম'-এর সংক্ষেপ। অর্থ যদি এখানে থামা না যায়, তবে অর্থের মধ্যে মারাত্মক ভুল হওয়ার আশংকা রয়েছে। সুতরাং এখানে থামাই উত্তম। কেউ কেউ একে ওয়াকফে-ওয়াজিব বলেছেন। কিন্তু এ ওয়াজিবের অর্থ এ নয় যে, এখানে না থামলে গোনাহ হবে। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, যতগুলো যতিচিহ্ন রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে এখানে থামাই সর্বোত্তম। (আন্-নশ্‌র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩১)

لا = 'লা তা'কেফ' শব্দের সংক্ষেপ। অর্থ এখানে থামা যাবে না। তবে থামা একেবারেই নাজায়েয, তা নয়। বরং এ চিহ্ন-বিশিষ্ট এমন অনেক স্থান রয়েছে, যেখানে থামা মোটেও দূষণীয় নয় এবং এর পরবর্তী শব্দ থেকে আয়াতের তেলাওয়াত শুরু করা যেতে পারে। তবে এখানে থামলে সামনে অগ্রসর হওয়ার সময় পুনরায় আগের আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়া উত্তম। (আন-নশর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৩)

উপরিউক্ত যতিচিহ্নগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত করেই বলা চলে যে, এগুলো আল্লামা

সাজাওয়ান্দী কর্তৃক প্রবর্তিত। কিন্তু এগুলো ছাড়া আরো কয়েকটি চিহ্ন কোরআনের আয়াতের মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

ع = 'মোয়ানাকা' শব্দের সংক্ষেপ। যে আয়াতে দু'ধরনের তফসীর হতে পারে, সেরূপ স্থানে এ চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক তফসীর অনুযায়ী এখানে বাক্য শেষ এবং অন্য তফসীর অনুযায়ী পরবর্তী চিহ্নে বাক্য শেষ বোঝায়। সুতরাং দু'জায়গার যে কোন এক স্থানে থামা যেতে পারে। তবে এক জায়গায় থামার পর পরবর্তী চিহ্নটিতেও থামা জায়েয হবে না। যেমন—

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ - وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ - كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ..... -

এ আয়াতে যদি তওরাত শব্দের মধ্যে ওয়াক্ফ করা হয়, তবে 'ইনজীল' শব্দের ওয়াক্ফ করা জায়েয হবে না। অপরপক্ষে, যদি ইন্জীল শব্দে এসে থামতে হয়, তবে আগের তওরাত শব্দে থামা জায়েয হবে না। উভয় স্থানের একটিতেও যদি না থামা হয়, তবে তাতেও কোন দোষ হবে না। চিহ্নটির আর এক নাম মোকাবিলাও ব্যবহৃত হয়। এ চিহ্নটি ইমাম আবুল-ফযল রাযী (র) প্রচলন করেছেন। (আন-নশর, পৃষ্ঠা ২৩৭; আল্-এতক্বান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৮)

سكتة—চিহ্নটির নির্দেশ হচ্ছে শ্বাস না ছেড়ে কিছুটা থামা দরকার। যেখানে একটু না থেমে পরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পাঠ করলে অর্থের ব্যাপারে ভুল বুঝবার অবকাশ রয়েছে—এ ধরনের জায়গায় চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়।

وقفة—এ চিহ্নযুক্ত স্থানে সেক্তার চাইতে একটু বেশী সময় থামতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শ্বাস ছুটে না যায়।

ق—কারো কারো মতে এ চিহ্নযুক্ত স্থানে থামা যেতে পারে।

قف—অর্থ, এখানে থামো। চিহ্নটি এমন স্থানে ব্যবহৃত হয়, যেখানে তেলাওয়াতকারীর মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে, বোধ হয় এখানে থামা যাবে না।

صلے—'আল-ওয়াসলু আওলা' বাক্যটির সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ পূর্বাপর দু'টি বাক্য মিলিয়ে পড়া ভাল।

صل—ক্বাদ্য়ূসালু—বাক্যের সংক্ষেপ। অর্থ কারো কারো মতে মিলিয়ে পড়া উত্তম এবং কারো কারো মতে থেমে যাওয়া ভাল।

وقف النبى صلى الله عليه وسلم—"বাক্যটি এমন স্থানে লেখা হয়, যেখানে কোন কোন বর্ণনামতে প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তেলাওয়াত করার সময় এখানে থেমেছিলেন।

কোরআনের মুদ্রণ ঃ মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন হওয়ার আগ পর্যন্ত কোরআন শরীফ হাতে লেখা হতো। যুগে যুগেই এমন একদল নিবেদিতপ্রাণ লোক ছিলেন, যাঁদের একমাত্র সাধনা ছিল কোরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করা। কোরআনের প্রতিটি অক্ষর সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করার লক্ষ্যে এ সাধক লিপিকারগণ যে অনন্য সাধনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, ইতিহাসে তার অন্য কোন নযীর নেই। কোরআনের সে লিপি সৌন্দর্যের ইতিহাস এতই দীর্ঘ যে, এজন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করা যেতে পারে।

মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর সর্বপ্রথম জার্মানীর হামবুর্গ শহরে হিজরী ১১১৩ সনে কোরআন শরীফ মুদ্রিত হয়। মুদ্রিত সেই কোরআনের একটি নোস্‌খা মিসরের দারুল-কুতুবে এখনো রক্ষিত রয়েছে। এরপর প্রাচ্যবিদদের অনেকেই ছাপাখানার মাধ্যমে কোরআন শরীফ মুদ্রণ করেন। কিন্তু মুসলিম-জাহানে সে সমস্ত মুদ্রিত কোরআন শরীফ মোটেও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলায়ে ওসমান কর্তৃক রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ১৭৮৭ খৃস্টাব্দে কোরআন শরীফ মুদ্রিত হয়। প্রায় একই সময়ে কাযান শহর থেকেও একটি নোস্‌খা মুদ্রিত হয়।

১৮২৮ খৃস্টাব্দে ইরানের তেহরানে লিথু মুদ্রণযন্ত্রে কোরআন শরীফের আর একটি নোস্‌খা মুদ্রিত হয়। এরপর থেকে দুনিয়ার অন্যান্য এলাকাতেও ব্যাপকভাবে ছাপাখানার মাধ্যমে কোরআনের নোস্‌খা মুদ্রণের রেওয়াজ প্রচলিত হয়। (তারীখুল-কোরআন, কুর্দি পৃষ্ঠা ১৮৬; ডক্টর ছাবহী ছালেহ্‌ লিখিত গ্রন্থের গোলাম আহমদ হারিরী কৃত উর্দু তরজমা, পৃষ্ঠা ১৪২)

ইল্‌মে তফসির

প্রসঙ্গক্রমে ইল্‌মে-তফসীর সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে। আরবী ভাষায় 'তফসীর' অর্থ উদ্‌ঘাটন করা বা খোলা। পরিভাষায় ইল্‌মে-তফসীর বলতে সেই ইল্‌মকে বোঝায়, যার মধ্যে কোরআন মজীদের অর্থসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে বর্ণনা করা হয় এবং কোরআনের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত সকল জ্ঞাতব্য বিষয় ও জ্ঞান-রহস্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। কোরআন মজীদে আল্লাহ্‌ তা'আলা মহানবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ -

—"আমি আপনার নিকট উপদেশ (গ্রন্থ, কোরআন) এজন্যই অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি মানুষের সামনে তাদের উদ্দেশে অবতীর্ণ বাণীসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন।"

পবিত্র কোরআনে আরও উক্ত হয়েছে ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ـ

—"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের প্রতি এটা বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের সামনে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং তাদের (অন্তরকে নাফরমানীর পঙ্কিলতা থেকে) পবিত্র করেন, তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব ও প্রজ্ঞাপূর্ণ তত্ত্বসমূহ শিক্ষা দেন।"

অতএব, মহানবী (সা) সাহাবায়ে কেরামকে শুধু কোরআনের শব্দই শিক্ষা দিতেন না, এর পুরো তফসীরও বর্ণনা করতেন। এ কারণেই প্রথম যুগের মুসলমানদের এক একটি সূরা পড়তে কোন কোন সময় কয়েক বছর লেগে যেত।

মহানবী (সা)-র জীবদ্দশায় কোন আয়াতের তফসীর অবগত হওয়া কোন সমস্যা ছিল না। কোন আয়াতের অর্থ বুঝতে যখনই কোন জটিলতা দেখা দিত, সাহাবায়ে-কেরাম মহানবী (সা)-র শরণাপন্ন হতেন। তাঁর কাছ থেকে তাঁরা সন্তোষজনক জবাব পেয়ে যেতেন। কিন্তু হযরত (সা)-র তিরোধানের পর কোরআনের শব্দাবলীর সাথে সাথে এর নির্ভুল অর্থও যাতে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং বিধর্মী পথভ্রষ্টদের পক্ষে এর অর্থ ও প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিকৃতি সাধনের কোন প্রকার অবকাশ না থাকে, সেজন্য কোরআনের তফসীরকে একটি স্বতন্ত্র ইল্ম আকারে সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে মুসলিম মনীষিগণ এ মহান দায়িত্বটি এত সুন্দর ও সুবিন্যস্তভাবে সম্পন্ন করেছেন যে, আজ কোনরূপ প্রতিবাদের তোয়াক্কা না করেই আমরা বলতে পারছি যে, আল্লাহ্র এই শেষ গ্রন্থের শুধু শব্দাবলীই সংরক্ষিত থাকেনি, তার নির্ভুল তফসীর বা ব্যাখ্যা যা মহানবী (সা) এবং তাঁর সাধক সাহাবীগণের দ্বারা আমাদের নিকট পৌঁছেছে তাও সুসংরক্ষিত আছে।

মুসলিম জাতি কিভাবে 'ইল্মে-তফসীর' সংরক্ষণ করল, এ ক্ষেত্রে তাদের কি পরিমাণ শ্রম-মেহনত ব্যয়িত হয়েছে এবং চেষ্টা-সাধনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে, তার এক চিত্তাকর্ষক ইতিহাস রয়েছে। সে ইতিহাস বর্ণনার অবকাশ এখানে কম। তবে কোরআন তফসীরের ব্যুৎপত্তিস্থল কি কি, 'ইল্মে-তফসীর' সম্পর্কে প্রতিটি ভাষায় যে অগণিত গ্রন্থ রয়েছে, ঐগুলোর লেখকগণ কোরআন শরীফের ব্যাখ্যায় কোন্ কোন্ উৎস থেকে সাহায্য নিয়েছেন, এখানে সংক্ষিপ্তভাবে সেগুলো কিছুটা বর্ণনা করা যেতে পারে।

ইল্মে-তফসীর-এর মূল উৎস মোট ছয়টি ঃ

১. **কোরআন মজীদ ঃ** ইল্মে তফসীর-এর প্রথম উৎস হচ্ছে কোরআন মজীদ। কোরআনে এ ধরনের এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, কোন আয়াতে হয়তো কোন কথা

অস্পষ্ট বা সংক্ষেপে বলা হয়েছে যা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কিন্তু অপর আয়াতে উক্ত আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। যেমন, সূরা ফাতিহার দোয়া সম্পর্কিত আয়াতে বলা হয়েছে যে صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ "আমাদেরকে ঐ সকল লোকের রাস্তা দেখাও, যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ।" কিন্তু এখানে এটা সুস্পষ্ট নয় যে, ঐ সকল লোক কারা, যাদের আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেছেন। তাই অপর এক আয়াতে সেসব ব্যক্তিকে এই মর্মে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে ঃ

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ ط -

—"তাঁরাই হচ্ছেন সেই সব লোক, যাঁদেরকে আল্লাহ্ নেয়ামত দান করেছেন, তাঁরা বিভিন্ন নবী-রসূল, সিদ্দীকীন, শহীদ ও সৎ কর্মশীল।"

মুফাস্সিরগণ কোন আয়াতের তফসীর করার সময় সর্বপ্রথম এটা লক্ষ্য করেন যে, সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা খোদ কোরআন মজীদের অপর কোন আয়াতে রয়েছে কিনা। যদি থাকে তাহলে ব্যাখ্যা হিসাবে ঐ আয়াতকেই গ্রহণ করে থাকেন। যদি কোরআনে সে আয়াতের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া না যায়, তবেই অন্যান্য উৎসের মধ্যে ব্যাখ্যা তালাশ করা বিধেয়।

২. **হাদীস ঃ** মহানবী (সা)-র বক্তব্য এবং কার্যাবলীকে 'হাদীস' বলা হয়। ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদের বাহকরূপে তাঁকে এজন্যই প্রেরণ করেছেন যে, তিনি মানব জাতির সামনে সুস্পষ্টভাবে কোরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা তুলে ধরবেন। কাজেই আল্লাহ্র রাসূল নিজের কথা ও কাজ—উভয় বিষয়েই এ মহান দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দর ও সুপরিকল্পিতভাবে পালন করেছেন। বস্তুত মহানবী (সা)-র গোটা জীবনই ছিল কোরআন মজীদের বাস্তব ও জীবন্ত ব্যাখ্যা। এজন্য মুফাস্সিরগণ কোরআন মজীদ অনুধাবনের জন্য দ্বিতীয় উৎস হিসেবে হাদীসের প্রতিই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিভিন্ন হাদীসের আলোকেই আল্লাহর কিতাবের অর্থ নির্ধারণ করেছেন। অবশ্য হাদীসের মধ্যে 'সহীহ', 'যয়ীফ' ও 'মওযু' প্রভৃতি ধরনের বর্ণনা আছে বলে সত্যানুসন্ধানী মুফাস্সিরগণ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতার পরীক্ষা নির্ধারিত মূলনীতির মানদণ্ডে হতো। কাজেই কোথাও কোন হাদীস পেয়েই বাছবিচার ব্যতিরেকে তার আলোকে কোরআনের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা স্থির করে ফেলা বৈধ নয়। কারণ হতে পারে, উক্ত হাদীসের প্রমাণ-সূত্র দুর্বল এবং অপর প্রামাণ্য হাদীসের পরিপন্থী। আসলে এ ব্যাপারটি অত্যন্ত নাজুক। এ ব্যাপারে কেবল সে সকল লোকই

হস্তক্ষেপ করতে পারেন, যাঁরা নিজেদের সমগ্র জীবনকে এই হাদীসশাস্ত্র আয়ত্তে আনার জন্য নিয়োজিত রেখেছেন।

৩. **সাহাবীগণের বক্তব্য ঃ** সাহাবায়ে-কেরাম মহানবী (সা) থেকে সরাসরি কোরআনের শিক্ষা লাভ করেছেন। এ ছাড়া ওহী নাযিলের যুগে তাঁরা বেঁচেছিলেন। কোরআন নাযিলের গোটা পরিবেশ ও পটভূমি প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের সামনে ছিল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই কোরআন মজীদের ব্যাখ্যা বা তফসীরের বেলায় তাঁদের বক্তব্য যত প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য হবে, পরবর্তী লোকদের কিছুতেই সে মর্যাদা থাকার কথা নয়। অতএব, যে সকল আয়াতের ব্যাখ্যা কোরআন বা হাদীস থেকে জানা যায় না, সেক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যই হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বের অধিকারী। কোনো আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবীগণ ঐকমত্যে পৌঁছুলে মুফাসসিরগণ তাঁদের সে সর্বসম্মত ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া সেক্ষেত্রে ভিন্ন কোন ব্যাখ্যা দান বৈধও নয়। তবে হ্যাঁ, কোনো আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যদি সাহাবীগণের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে থাকে, সে ক্ষেত্রে পরবর্তী তফসীরকারগণ অন্য প্রমাণাদির আলোকে এটা পরীক্ষা করে দেখতেন যে, ঐগুলোর কোন্ মতটিকে প্রাধান্য দেওয়া যায়? এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যই বহু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছে। রচিত হয়েছে 'উসূলে-ফিকাহ্' 'উসূলে-হাদীস' ও 'উসূলে তফসীর'। সে সব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে অনুপস্থিত।

৪. **তাবেয়ীনদের বক্তব্য ঃ** এ ব্যাপারে সাহাবাগণের পরবর্তী মর্যাদা হলো তাবেয়ীনদের। যে সব মহৎ ব্যক্তি সাহাবীগণের মুখ থেকে কোরআনের ব্যাখ্যা শোনার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদেরকেই 'তাবেয়ী' বলা হয়। এ কারণে তাবেয়ীগণের বক্তব্যও তফসীরশাস্ত্রে বিরাট গুরুত্বের অধিকারী। অবশ্য তাবেয়ীগণের বক্তব্য তফসীরের ক্ষেত্রে দলীল কি না এ নিয়ে বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। (আল্-ইতক্বান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৯) তবে তফসীরের ক্ষেত্রে তাবেয়ীগণের বক্তব্যের গুরুত্ব যে অত্যন্ত বেশী, সে ব্যাপারে কেউ মতভেদ করেন নি।

৫. **আরবী সাহিত্য ঃ** কোরআন মজীদ যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ সেহেতু কোরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উক্ত ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা একান্ত জরুরী। কোরআনে এমন অসংখ্য আয়াত আছে যেগুলোতে শানে-নযূল (পটভূমি) কিংবা অপর কোন ফেকহী বা বিশ্বাস সংক্রান্ত কোন জটিলতা থাকে না। সেগুলোর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিংবা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের বক্তব্যও না থাকায় একমাত্র আরবী সাহিত্যের ভাবধারা অবলম্বন করেই ঐ সকল আয়াতের তফসীর করা হয়। এ ছাড়া কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় যদি কোন প্রকার মতবৈষম্য থাকে, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন মতের মধ্য থেকে গ্রহণযোগ্য মত নির্ধারণে সিদ্ধান্তের বেলায়ও আরবী সাহিত্য থেকে সাহায্য নিতে হয়।

৬. **চিন্তা-গবেষণা ও উদ্ভাবন ঃ** তফসীরের সর্বশেষ উৎস হলো চিন্তা-গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তি। কোরআন মজীদের সূক্ষ্ম রহস্যাবলী ও তাৎপর্য এমন একটি

অকূল সমুদ্র, যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদান করেছেন, সে তাতে যতই চিন্তা-গবেষণা করবে, ততই নিত্য নতুন রহস্যাবলী তার সামনে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকবে। তফসীরকারকগণ নিজ নিজ উদ্ভাবনী প্রতিভা ও গবেষণার ফলাফল নিজেদের তফসীরসমূহে বর্ণনা করেছেন। তবে এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন সে ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লিখিত পাঁচটি উৎসের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। অতএব, কোন ব্যক্তি যদি কোরআনের এমন কোন ব্যাখ্যা পেশ করে যা কোরআন, সুন্নাহ্, ইজমা বা সাহাবী-তাবেয়ীদের বক্তব্যের পরিপন্থী ও আরবী ভাষাগত তথ্যের বরখেলাফ হয় অথবা শরীয়তের অপর কোন মূলনীতির বিপরীত হয়, তা হলে ঐ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। সূফীগণের কেউ কেউ কোরআন মজীদের তফসীরে এ জাতীয় নব-নব রহস্য বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু মুসলিম মিল্লাতের কোরআন-সুন্নাহ্-বিশারদ সুপণ্ডিত ওলামায়ে কেরাম সেগুলোকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। কারণ ইল্‌মে-তফসীরের ক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহ্ এবং শরীয়তের মৌল-নীতিসমূহের পরিপন্থী কারও কোন ব্যক্তিগত মতের কোনই মূল্য নেই।

ইসরাইলী বর্ণনা সম্পর্কে নির্দেশ

'ইসরাইলিয়াত' বা ইসরাইলী বর্ণনা বলতে ঐ সকল বর্ণনা বোঝায়, যেগুলোর প্রমাণ-সূত্রের গোড়ায় আহলে-কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টান বর্ণনাকারিগণ রয়েছে। প্রথম যুগের মুফাস্‌সিরগণ আয়াতের নিচে এমন সকল প্রকার বর্ণনাই (রেওয়ায়েত) লিখে দিতেন, যেগুলো সনদ সহকারে তাঁদের কাছে পৌঁছাতো। সেগুলোর মধ্যে অনেক বর্ণনা ছিল ইসরাইলিয়াত তথা আহলে-কিতাবদের বর্ণিত। কাজেই সেগুলোর সত্যাসত্য সম্পর্কেও অবহিত হওয়া একান্ত জরুরী। এ জাতীয় বর্ণনার উৎস তালাশ করলে দেখা যায়, যেসব সাহাবী বা তাবেয়ী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আহলে-কিতাব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাঁদের সেই আগেকার জ্ঞানসূত্র থেকে প্রধানত এসব বর্ণনা ইল্‌মে-তফসীরে অনুপ্রবেশ করেছে। কোরআন মজীদে অতীত জাতিসমূহের এমন বহু ঘটনা বর্ণিত আছে, যেগুলো তাঁরা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহে পড়ে এসেছিলেন। কোরআনে উল্লিখিত এ সকল ঘটনা আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা আহ্‌লে কিতাব সূত্র থেকে প্রাপ্ত বর্ণনাগুলোরও উল্লেখ করতেন। এসব বর্ণনাকেই মুফাস্‌সিরগণ 'ইসরাইলিয়াত' নামে চিহ্নিত করে দিয়েছেন।

হাফেয ইবনে কাসীর (র) একজন বিচক্ষণ ও বিশিষ্ট মুফাস্‌সির ছিলেন। তিনি 'ইসরাইলিয়াত'-কে তিন ভাগে ভাগ করেছেন ঃ

(১) যে সকল বর্ণনা কোরআন ও সুন্নাহ্‌র অপরাপর দলীলাদি দ্বারা প্রমাণিত। যেমন ফেরাউনের ডুবে মরা এবং হযরত মূসা (আ)-র তূর পর্বতে গমন প্রভৃতি।

(২) যে সব বর্ণনা কোরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রমাণাদি দ্বারা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন। যেমন, ইসরাইলী বর্ণনাসমূহে উল্লেখ আছে যে, হযরত সুলায়মান (আ) তাঁর শেষ বয়সে

(নাউযুবিল্লাহ) মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে গিয়েছিলেন। খোদ কোরআন মজীদ তার প্রতিবাদ করে ঘোষণা করেছে :

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا

—"সুলায়মান আল্লাহ্‌র অবাধ্য হন নি, বরং শয়তানরাই আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে।" এমনি ধরনের আরও দৃষ্টান্ত আছে। যেমন, ইসরাইলী বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, (নাউযুবিল্লাহ্) হযরত দাউদ (আ) তাঁর সেনাপতি 'উরিয়া'-র স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছিলেন কিংবা নানা ফন্দি-ফিকির করে তাকে হত্যা করিয়ে তার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন। এটাও একটা নিছক মিথ্যা অলীক বর্ণনা। এ ধরনের বর্ণনাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা জ্ঞান করা অপরিহার্য।

(৩) যেসব বর্ণনার ব্যাপারে কোরআন-সুন্নাহ্ ও শরীয়তের অন্যান্য দলীল-প্রমাণ নীরব। যেমন, তওরাতের বিধান ইত্যাদি বর্ণনা সম্পর্কে মহানবী (সা)-র শিক্ষা হলো নীরব থাকা। এগুলোর ব্যাপারে সত্য-মিথ্যা কোন মন্তব্য না করা। অবশ্য এ ব্যাপারে ওলামায়ে-কেরামের মধ্যে মতভেদ আছে যে, এ সকল বর্ণনা নকল করা বৈধ কিনা। হাফেয ইবনে কাসীরের মতে এ জাতীয় রেওয়ায়েতের বর্ণনা বৈধ বটে, কিন্তু তাতে কোন ফায়দা নেই। কারণ শরীয়তের দিক থেকে এসব বর্ণনা প্রমাণযোগ্য নয়। (মোকাদ্দমা-এ ইবনে-কাসীর)

তফসীর সম্পর্কে ভুল ধারণার অপনোদন

উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কোরআনের ব্যাখ্যার ব্যাপারটি অত্যন্ত নাজুক ও জটিল কাজ। এজন্য শুধু আরবী ভাষা জানাই যথেষ্ট নয়। কোরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য সকল শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা থাকতে হবে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ওলামায়ে-কেরাম লিখেছেন,—যিনি কুরআনের ব্যাখ্যা বা তফসীর করবেন, তাঁকে নিম্নলিখিত শাস্ত্রসমূহে পারদর্শী হতে হবে :

(১) আরবী ভাষার ব্যাকরণ (২) অলঙ্কারশাস্ত্র (৩) আরবী ভাষা-সাহিত্য ছাড়াও (৪) হাদীসশাস্ত্র (৫) ফেকাহশাস্ত্র (৬) তফসীরশাস্ত্র এবং (৭) আকায়েদ ও কালামশাস্ত্রের ব্যাপারে ব্যাপক ও গভীর ব্যুৎপত্তি থাকতে হবে। এ সকল জ্ঞান-শাস্ত্রের সাথে সম্পর্ক-বর্জিত কোন ব্যক্তি কোরআনের ব্যাখ্যা দানে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবে না।

পরিতাপের বিষয় যে, কিছুকাল থেকে মুসলমানদের মাঝে এ মারাত্মক ব্যাধি এমন মহামারী আকারে চলে আসছে যে, অনেক লোক শুধু আরবী পড়াকেই কোরআন তফসীরের জন্য যথেষ্ট বলে ধরে নিয়েছে। ফলে যে কোন লোকই আজকাল আরবী ভাষায় মামুলী জ্ঞান অর্জন করেই কোরআনের ব্যাখ্যায় নিজের মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করে দেয়। কোন কোন সময় এমনও দেখা গেছে যে, এক ব্যক্তি হয়তো আরবী ভাষায় তার

সামান্য কিছু জ্ঞান ছাড়া দক্ষতা নেই, কিন্তু সে কেবল মনগড়াভাবেই কোরআনের ব্যাখ্যা শুরু করে না বরং পূর্ববর্তী মুফাস্‌সিরগণেরও ভুলভ্রান্তি বের করতে শুরু করে দেয়। আরও মজার ব্যাপার এই যে, শুধু অনুবাদ পড়েই অনেকে নিজেকে কোরআন সম্পর্কে মস্ত বড় আলেম মনে করতে থাকে এবং বড় বড় মুফাস্‌সিরের সমালোচনা করতে একটুও দ্বিধা করে না।

বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এটা অত্যন্ত ভয়াবহ প্রবণতা। দ্বীনের ব্যাপারে এটা ধ্বংসাত্মক বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়। বৈষয়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকেফহাল এমন যে কোন ব্যক্তি এটা বুঝে যে, এক ব্যক্তি শুধু ইংরেজী ভাষা শিখে তার সাহায্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের কয়েকটি বড় বড় বই পড়ে নিলেই দুনিয়ার কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি তাকে চিকিৎসক হিসাবে মেনে নেবে না এবং (রোগী হয়ে) নিজের জীবনকে সে ব্যক্তির হাতে সঁপে দেবে না। চিকিৎসক হতে হলে তাকে যথারীতি চিকিৎসা সম্পর্কিত বিদ্যালয়ে নিয়মিত পড়তে হবে। হাতে-কলমে চিকিৎসার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। তেমনি-ভাবে কোন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্রের বই-পুস্তক পড়ে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, তাহলে দুনিয়ার কোন সচেতন মানুষ তাকে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে স্বীকৃতি দেবে না। কারণ ইংরেজী ভাষা জানা আর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা এক কথা নয়। এ কাজ শুধু ভাষা জানার দ্বারা হয় না। এজন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দের অধীনে যথারীতি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ পূর্বশর্ত। ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে যদি এসব কঠোর শর্ত পালন জরুরী হয়, সেক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার ব্যাপারেও কেবল আরবী ভাষা জেনে নেওয়াই যথেষ্ট নয়। জীবনের সকল স্তরের মানুষ এই মূলনীতির ব্যাপারে সচেতন এবং সে অনুযায়ী কাজও করে। প্রতিটি বিদ্যা ও শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভের একটি বিশেষ পদ্ধতি এবং এর জন্য কিছু পূর্বশর্ত থাকে। ঐ সকল পদ্ধতি ও পূর্বশর্ত পূরণ ছাড়া সংশ্লিষ্ট বিদ্যা বা শাস্ত্রের ব্যাপারে তার মতামতকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় না। এ ছাড়া কোরআন-হাদীস এতই লা-ওয়ারিশ নয় যে, এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে কোন ইল্‌ম বা বিদ্যা অর্জনের প্রয়োজন হবে না এবং যার যেমন খুশী এ ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করে দেবে! কেউ কেউ বলেন, খোদ কোরআন মজীদেই রয়েছে যে,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

"নিঃসন্দেহে আমি কোরআন মজীদকে উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সহজ করে দিয়েছি।" কাজেই কোরআন একটি সহজ গ্রন্থ হওয়ায় এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য লম্বা-চওড়া ইল্‌ম বা বিদ্যার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ ধরনের যুক্তি মস্তবড় বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। জ্ঞানের অগভীরতা ও বিষয়ের ভাসাভাসা ধারণাই হচ্ছে এ যুক্তির ভিত্তি। আসল ব্যাপার হলো, কোরআনের আয়াতসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

১. কিছু আয়াত আছে যেগুলোতে সাধারণ উপদেশের কথা, শিক্ষামূলক ঘটনা-বলী, শিক্ষা ও নসীহতমূলক বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, এ বস্তুজগতের

স্থায়িত্বহীনতা, বেহেশত-দোযখের অবস্থা, আল্লাহ্‌র ভয়, পরকালের চিন্তা জাগ্রতকারী বিভিন্ন কথা, জীবনের অন্যান্য সহজ-সরল, সত্য ও বাস্তব বিষয়সমূহ ইত্যাদি। এ ধরনের আয়াত-সমূহ সত্যিই সহজ-সরল। আরবী ভাষা সম্পর্কে অবগত যে কোন ব্যক্তিই এসব আয়াত বুঝতে এবং এগুলো থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে এ ধরনের শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ আমি এগুলো সহজ করে দিয়েছি। খোদ আয়াতে বর্ণিত لِلذِّكْرِ (উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে) শব্দও একথাই বোঝায়।

২. পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের আয়াতসমূহ হলো বিধি-বিধান, আইন-কানুন, আকীদা-বিশ্বাস ও জ্ঞানমূলক বিষয়সম্বলিত। এ ধরনের আয়াতসমূহ যথাযথভাবে অনুধাবন এবং সেগুলো থেকে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ ও নিয়ম-বিধিসমূহের উদ্ভাবন করা যে কোন ব্যক্তির কাজ নয়। এজন্য ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে একজন লোককে পূর্ণ দক্ষতা ও প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে। বস্তুত এ কারণেই সাহাবায়ে-কেরামের মাতৃভাষা আরবী হওয়া এবং আরবী শিক্ষার জন্যে অপর কোন স্থানে যাবার প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা মহানবী (সা)-র নিকট দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোরআন শিক্ষা করতেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ইমাম আবু আবদুর রহমান সিলমী থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, সাহাবায়ে-কেরামের মধ্য থেকে যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যথারীতি কোরআন মজীদ শিক্ষা করেছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত ওসমান (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) প্রমুখ আমাদের বলেছেন ঃ আমরা যখন কোরআন মজীদের দশটি আয়াত শিখতাম তখন এসব আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানমূলক ও ব্যবহারিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় আয়ত্তে আনার পূর্বে রাসূল (সা)-এর সামনে যেতাম না। তিনি বলতেন ঃ

تعلمنا القران والعلم والعمل جميعا

"আমরা কোরআন এবং জ্ঞান ও ব্যবহার পদ্ধতি (আমল) এক সাথেই শিখেছি।"

হাদীস গ্রন্থ 'মুআত্তা-এ-ইমাম মালেক'-এ বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) একমাত্র সূরা বাক্কারাহ্ শিখতেই দীর্ঘ আট বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তেমনিভাবে মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস (রা) বলেছেন, আমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি সূরা বাক্কারাহ্ এবং সূরা আলে-ইমরান পড়ে ফেলতেন, আমাদের কাছে তাঁর মর্যাদা অনেক বেড়ে যেতো। (ইতক্কান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৬)

লক্ষণীয় যে, যে সকল সাহাবীর মাতৃভাষা ছিল আরবী, যারা কাব্য ও সাহিত্য চর্চায় পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন—সামান্য মনোযোগের দ্বারা যাঁরা দীর্ঘ কবিতা মুখস্থ করে ফেলতেন—কোরআন শিক্ষা ও তার ভাবার্থ বোঝার জন্যে তাঁদেরকেও এত দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ করতে হতো, যার জন্য মাত্র একটি সূরা পড়তেই দীর্ঘ আট বছর লেগে যেতো। তার একমাত্র কারণ ছিল এই যে, কোরআন মজীদ এবং তার অন্তর্নিহিত জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্তে আনার জন্যে শুধু আরবী ভাষার উপর দক্ষতাই যথেষ্ট ছিল না, বরং

এজন্য হযরত (সা)-এর সংসর্গ ও তাঁর শিক্ষাদান থেকে উপকৃত হওয়াও জরুরী ছিল। অতএব এটা স্পষ্ট কথা যে, সাহাবায়ে-কেরামকে যখন আরবী ভাষায় দক্ষতা ও ওহী নাযিলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও "কোরআনের আলেম" হবার জন্য যথারীতি হুযুর (সা) থেকে শিক্ষা লাভ করার দরকার ছিল, তখন কোরআন নাযিলের প্রায় দেড় হাজার বছর পর আরবী ভাষায় মামুলী জ্ঞান অর্জন করে কিংবা শুধু অনুবাদ পড়েই কোরআনের মুফাস্‌সির হবার দাবী যে কত বড় ঔদ্ধত্য এবং ইল্‌মে-দ্বীনের সাথে কিরূপ দুঃখজনক বিদ্রূপ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ধরনের ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারীদের মহানবী (সা)-র বাণীটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত ঃ

من قال فى القران بغير علم فليتبوأ مقعده فى النار

'যে ব্যক্তি ইল্‌ম ছাড়া কোরআনের ব্যাপারে বক্তব্য রাখে, সে যেন জাহান্নামেই নিজের স্থান করে নেয়।" (আবূ দাউদ, ইতকান)

হযরত (সা) আরও বলেছেন ঃ

من تكلم فى القران برأيه فاصاب فقد اخطأ

"কোরআনের ব্যাপারে যে নিজের রায়ে কথা বলে তার বক্তব্য শুদ্ধ হলেও বক্তার পক্ষে তা অমার্জনীয় অপরাধ।"

কতিপয় প্রসিদ্ধ তফসীর

মহানবী (সা)-র তিরোধানের পর অসংখ্য তফসীরগ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে। কোরআন মজীদের উপর এত অধিক গবেষণা ও ব্যাখ্যা-গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, বিশ্বের কোনো (ধর্ম) গ্রন্থের ব্যাপারে তা হয়নি। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা তো দূরের কথা একটি দীর্ঘ ও বিস্তারিত গ্রন্থে ঐ সকল তফসীরের পরিচিতি দান সম্ভব নয়। তবে আমি শুধু এখানে ঐ সকল গুরুত্বপূর্ণ তফসীর গ্রন্থেরই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরতে চাই, যেগুলো থেকে এই তফসীর গ্রন্থ লেখার সময় সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং এর স্থানে স্থানে যেগুলোর হাওয়ালা দেওয়া হয়েছে। এ তফসীর লেখার সময় বহু তফসীর এবং আনুষঙ্গিক জ্ঞানের শত শত গ্রন্থ আমার সামনে ছিল। কিন্তু এখানে শুধু ঐ সকল তফসীরের আলোচনাই উদ্দেশ্য, প্রধানত যেগুলোর হাওয়ালা এ গ্রন্থে প্রদান করা হয়েছে।

তফসীরে ইবনে জরীর ঃ এ তফসীরের প্রকৃত নাম 'জামেউল-বায়ান'। লেখক আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর তাবারী (র) (ওফাত ৩১০ হিঃ)। আল্লামা তাবারী একজন উঁচু স্তরের মুফাসসির এবং মুহাদ্দেস (হাদীসবেত্তা) ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি অব্যাহতভাবে দীর্ঘ চল্লিশ বছর রচনায় মগ্ন ছিলেন। প্রতিদিন চল্লিশ পৃষ্ঠা করে লেখা তাঁর রুটিন ছিল। (আল-বিদায়া ওয়ান্নিহায়া' খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ১৪৫)

কেউ কেউ তাঁর ব্যাপারে শিয়া হবার অভিযোগ তুলেছিলেন। কিন্তু ইসলামী জ্ঞান গবেষকগণ এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রকৃত ব্যাপারও তাই। তিনি ছিলেন

"আহলে-সুন্নত আল-জমায়াতভুক্ত" অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন বিচক্ষণ ইসলামী জ্ঞান-সমৃদ্ধ পণ্ডিত। তাঁকে মুজতাহিদ ইমামগণের একজন বলে গণ্য করা হয়।

আল্লামা তাবারীর তফসীরখানা দীর্ঘ ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত। পরবর্তী তফসীরসমূহের জন্য এ তফসীর গ্রন্থটি মৌলিক উৎস হিসাবে গণ্য। ইমাম তাবারী কোরআনের আয়াত-সমূহের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অতঃপর যে বক্তব্যটিকে তিনি প্রবল বলে বিবেচনা করেছেন সেটাকে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করেছেন। অবশ্য তাঁর তফসীরে 'সহীহ্' বর্ণনার সাথে 'সকীম' (প্রামাণ্য ও প্রমাণ-পদ্ধতির মাপকাঠিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলে বিবেচিত) বর্ণনাও স্থান পেয়েছে। এ কারণে তাঁর বর্ণিত সকল বর্ণনার উপর সমান আস্থা পোষণ করা যায় না। আসলে এ তফসীর লেখার সময় তাঁর লক্ষ্য ছিল, ঐ সময় কোরআনের তফসীর সম্পর্কিত যত বর্ণনা যেখানে পাওয়া যায় সবগুলো একই জায়গায় সন্নিবেশিত করা, যেন এসব উপকরণ থেকে পরবর্তী গবেষকগণ উপকৃত হতে পারেন। তবে তিনি প্রতিটি বর্ণনার উদ্ধৃতি প্রমাণকালে তার সনদ অর্থাৎ প্রমাণ-সূত্রেরও উল্লেখ করেছেন। এর ফলে কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি বর্ণনাকারী সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে উক্ত বর্ণনার শুদ্ধাশুদ্ধির ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারবেন।

তফসীরে ইবনে কাসীর ঃ এ তফসীরের লেখক হাফেয এমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর দামেশ্কী শাফেয়ী (র) (ওফাত ৭৭৪ হিঃ)। ইনি হিজরী অষ্টম শতকের বিশিষ্ট গবেষক-পণ্ডিত আলেমদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর তফসীরটি চার খণ্ডে প্রকাশিত। কোরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহই তাতে বেশী স্থান পেয়েছে। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, লেখক বিভিন্ন বর্ণনায় মুহাদ্দেস-সুলভ সমালোচনা করেছেন। এজন্য সকল তফসীর গ্রন্থের মধ্যে ইবনে কাসীর এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তফসীরুল-কুরতুবী ঃ তফসীরের পুরো নাম "আল-জামে লে-আহকামিল-কোরআন।" স্পেনের খ্যাতনামা গবেষক আলেম আল্লামা আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু বকর ইবনে ফারাহ আল-কুরতুবী, (ওফাত ৬৭১ হিঃ) হচ্ছেন এ তফসীরের লেখক। তিনি ফেক্হী মাযহাবের দিক থেকে ইমাম মালেকের মতানুসারী। এবাদত ও সাধনার দিক থেকে বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। মূলত এ গ্রন্থের মৌলিক বিষয়বস্তু ছিল কোরআন মজীদ থেকে ব্যবহারিক বিধিসমূহের উদ্ভাবন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তিনি আয়াত ও জটিল শব্দসমূহের ব্যাখ্যা, 'এরাব' (স্বর-চিহ্ন) ভাষার অলঙ্কার ও সংশ্লিষ্ট বর্ণনাসমূহও সন্নিবেশিত করেছেন। তফসীরে-কুরতুবী ১২ খণ্ডে বিভক্ত এবং এর বহু সংস্করণ বের হয়েছে।

তফসীরে কবীর ঃ এ তফসীর লিখেছেন ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র) (ওফাত ৬০৬ হিঃ)। কিতাবের নাম 'মাফাতীহুল-গায়েব'। কিন্তু পরবর্তীকালে 'তফসীরে কবীর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইমাম রাযী ছিলেন 'কালামশাস্ত্রের' ইমাম। এ

কারণেই তাঁর তফসীরের যুক্তি,.'কালামশাস্ত্র' সম্পর্কিত আলোচনা এবং বাতিল পন্থীদের বিভিন্ন মতবাদ খণ্ডনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বস্তুত কোরআনের মর্মার্থ উদ্‌ঘাটনের দিক থেকে এটি একটি অতুলনীয় তফসীরগ্রন্থ। এ তফসীরে যে হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে কোরআনের মর্মবাণীর বিশ্লেষণ এবং আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করা হয়েছে তা অতি চমৎকার। কিন্তু ইমাম রাযী (র) সূরা আল-ফাত্‌হ্ পর্যন্ত এ তফসীর নিজে লিখেছেন। তারপর তিনি আর লিখতে পারেন নি। সূরা আল্-ফাত্‌হ্ থেকে অবশিষ্ট অংশ লিখেছেন কাযী শাহাবুদ্দীন ইবনে খলীলুল-খোলী দামেশকী (ওফাত ৬৩৯ হিঃ) মতান্তরে শায়খ নজমুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কামুলী (ওফাত ৭৭৭ হিঃ)। (কাশফুয-যুনূন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৭)

তৎকালীন যুগের চাহিদা মাফিক যেহেতু ইমাম রাযী 'কালামশাস্ত্রীয়' আলোচনা ও বাতিলপন্থীদের ভ্রান্ত মতবাদসমূহ খণ্ডনের ব্যাপারে তাঁর তফসীরে অধিক জোর দিয়েছেন এবং প্রসঙ্গত সেসব আলোচনা বহু স্থানে দীর্ঘায়িত হয়েছে। এ কারণে কেউ কেউ এর সমালোচনা করে বলেছেন ঃ فيه كل شيء الا التفسير "এ গ্রন্থে তফসীর ছাড়া আর সব কিছুই আছে।" তফসীরে-কবীরের ক্ষেত্রে এ ধরনের মন্তব্য অন্যায়। মূলত এর মর্যাদা তাই, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ কোরআনের ভাবার্থ উদ্‌ঘাটনের দিক থেকে এ তফসীরের গুরুত্ব অনেক উর্ধ্বে। অবশ্য বিশেষ দু'একটি স্থানে এ তফসীরে জমহুর ওলামায়ে উম্মতের অনুসৃত মতের বিপরীত মত ব্যক্ত হয়েছে। আট খণ্ডের এই বিশাল গ্রন্থে এ জাতীয় কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করার মত নয়।

তফসীর আল্-বাহরুল-মুহীত ঃ আল্লামা আবু হাইয়্যান গারনাতী আন্দালুসী (ওফাত ৭৫৪ হিঃ) এ তফসীরের লেখক। তিনি ইসলামী জ্ঞান-প্রজ্ঞায় পারদর্শী হওয়া ছাড়াও আরবী ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর তফসীরে কালামুল্লাহ্‌র বৈয়াকরণিক ও আলংকারিক দিকের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি প্রতিটি আয়াতের শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা করেছেন। পদবিন্যাসের বিভিন্নতা ও আলংকারিক সূক্ষ্ম রহস্য বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

আহকামুল-কোরআন লিল্-জাস্‌সাস ঃ ইমাম আবু বকর জাসসাস রাযী (র) (ওফাত ৩৭০ হিঃ) কর্তৃক এ তফসীরটি লিখিত। ফেকহী মাযহাবের দিক থেকে তিনি হানাফী মতের একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ইমাম। এ তফসীরটির বিষয়বস্তু হলো কোরআন মজীদ থেকে বিভিন্ন মাসআলা উদ্ভাবন। তিনি ধারাবাহিকভাবে আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার বদলে কেবল ঐ সকল আয়াতেরই ব্যাখ্যা করেছেন যেগুলো বিভিন্ন ব্যবহারিক নিয়ম-বিধিসম্বলিত। এ বিষয়ের উপর আরও কয়েকটি গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। তবে তাদের চাইতে 'আহকামুল-কোরআন লিল্-জাসসাস'-এর স্থানই উর্ধ্বে।

তফসীর আদ্-দুররুল-মানসূর ঃ এ তফসীরের লেখক আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (ওফাত ৯১০ হিঃ)। এর পুরা নাম 'আদ্-দুররুল-মানসূর ফী তাফসীর বিল মাসূর'।

তাতে লেখক নিজের সাধ্যানুযায়ী কোরআনের ব্যাখ্যাসম্বলিত সকল আয়াতকে এক জায়গায় সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর পূর্বে হাফেয ইবনে জরীর (র), ইমাম বগভী (র), ইবনে মরদভিয়া (র), ইবনে হাইয়্যান (র) প্রমুখ হাদীসবেত্তা নিজ নিজ পদ্ধতিতে এ কাজ করেছেন।

আল্লামা সুয়ূতী তাঁদের সকলের বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ তাঁর গ্রন্থে একত্র করেছেন। তবে তিনি প্রতিটি রেওয়ায়েতের সাথে ঐগুলোর পুরো সনদ (প্রমাণ সূত্র)-এর উল্লেখ না করে কেবল লেখকের নামই উল্লেখ করেছেন, যিনি নিজের সনদে উক্ত রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তাতে প্রয়োজনে সনদ অনুসন্ধান করা যাবে। যেহেতু তাঁর লক্ষ্য ছিল সংশ্লিষ্ট বর্ণনাসমূহ একত্র করা, এ কারণে সুয়ূতীর এই তফসীরগ্রন্থেও প্রামাণিক ও প্রমাণ-সূত্রের দিক থেকে দুর্বল বর্ণনা স্থান পেয়েছে। প্রমাণ-সূত্রের অনুসন্ধান না করে তাঁর বর্ণিত সকল রেওয়ায়েতকে নির্ভরযোগ্য বলা যাবে না। আল্লামা সুয়ূতী (র) ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিটি রেওয়ায়েতের সাথে তার সনদ বা প্রমাণ-সূত্র কোন্ ধরনের সে ব্যাপারেও আলোক-পাত করেছেন। কিন্তু হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারের ব্যাপারে তাঁর দুর্বলতা স্পষ্ট। কাজেই এ ব্যাপারেও নির্বিচারে পূর্ণ আস্থা আনা মুশকিল।

তফসীরে-মাযহারী ঃ আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র) (ওফাত ১২২৫ হিঃ) প্রণীত। লেখক তাঁর আধ্যাত্মিক ওস্তাদ মাযহার জানে-জানান দেহলভী (র)-র নামানুসারে এ তফসীরের নামকরণ করেছেন। এটি একখানা সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল তফসীর গ্রন্থ। সংক্ষেপে কোরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা জানার জন্যে অতীব উপকারী। লেখক কোরআনের শব্দাবলীর বিশ্লেষণের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসেরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। অপরাপর তফসীরের তুলনায় এ গ্রন্থে হাদীসের উদ্ধৃতি দানে সতর্কতা অবলম্বনের ছাপ সুস্পষ্ট।

রূহুল মা'আনী ঃ তফসীরটির পুরো নাম 'রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল-কোরআনিল-আযীম ওসাস সাবায়ে মাসানী'। বাগদাদের পতনকালের অব্যবহিত আগের প্রখ্যাত ইসলামী জ্ঞানবিশারদ আল্লামা মাহমূদ আলূসী (র) এ তফসীরখানা লিখেছেন। তফসীরে রূহুল-মা'আনী ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত। লেখক এ বিরাট তফসীর গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গীণ ও ব্যাপকভিত্তিক করার জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন। ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলংকার ছাড়াও তিনি এতে ইসলামী বিধি-বিধান, আকায়েদ-বিশ্বাস, কালাম-শাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, তাসাউফ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। সংশ্লিষ্ট আয়াত সম্পর্কিত জ্ঞানের কোনো দিকের পিপাসাই যাতে পাঠকচিত্তে অবশিষ্ট না থাকে লেখক সে ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। হাদীসের উদ্ধৃতি দানেও এ গ্রন্থের লেখক অন্যান্য তফসীরকারের তুলনায় সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। এদিক থেকে "তফসীরে রূহুল মা'আনী" একটি সুবিস্তৃত তফসীরগ্রন্থ। তফসীর সম্পর্কিত যে কোনো ব্যাপারে এ কিতাবের সহায়তা থেকে কেউ নিরাশ হয় না।

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন প্রসঙ্গে

কোরআন শরীফের একখানা স্বতন্ত্র তফসীর রচনা করার দুঃসাহস ছিল আমার স্বপ্নেরও অতীত। কিন্তু তা সত্ত্বেও অত্যন্ত স্বাভাবিক গতিতেই আল্লাহ্ পাকের খাস রহম করমে তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন রচনার সকল উপকরণ একত্র হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা পরিপূর্ণ 'তফসীর'-এর রূপ পরিগ্রহ করেছে। তবে দীর্ঘকাল থেকেই হযরত হাকীমুল-উম্মত থানবী (র) রচিত বয়ানুল-কোরআন আরো সহজ ভাষায় এ যুগের মানুষের মেধা ও সাধারণ পাঠকগণের চাহিদানুযায়ী সহজবোধ্য করে পেশ করার আরজু মনে মনে পোষণ করে আসছিলাম। কিন্তু সে কাজটিও অত্যন্ত জটিল এবং শ্রমসাধ্য ছিল বিধায় এতদিন তা হয়ে ওঠেনি। আল্লাহ্র শোকর যে, মা'আরেফুল-কোরআনের মাধ্যমে সে আরজুটুকুও তিনি পূর্ণ করে দিয়েছেন। কেননা এ তফসীর প্রধানত হযরত থানবী (র)-র বয়ানুল-কোরআনকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে।

কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

এক. আরবী ছাড়া দুনিয়ার অন্য যে কোন ভাষায় কোরআন শরীফের তফসীর করার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা নাজুক ব্যাপার হচ্ছে মূল কোরআনের তরজমা। কেননা কোরআনের আয়াত ভাষান্তরিত করার অর্থ সে ভাষায় আল্লাহ্র কালামকে ব্যক্ত করা। এর মধ্যে সামান্যতম তারতম্য বা বেশ-কম করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়। এজন্য আমি নিজের তরফ থেকে আয়াতের তরজমা করার দুঃসাহসই করিনি! বস্তুত এর প্রয়োজনও ছিল না। কেননা আমাদের পূর্বসূরি সাধক আলেমগণ বিশেষ যত্ন ও সাবধানতার সাথে এ কাজ করে গেছেন। উর্দূ ভাষায় সর্বপ্রথম হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্র দুই সুযোগ্য সন্তান—শাহ্ রফীউদ্দীন এবং শাহ্ আবদুল কাদের—এমন দক্ষতার সাথে অনুবাদের কাজ আন্জাম দিয়ে গেছেন যে, অতঃপর তরজমার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির আশংকা খুবই কম।

হযরত শাহ রফীউদ্দীন কোরআন পাকের একেবারে শাব্দিক অনুবাদ করেছেন। পরিভাষার বা উর্দূ ভাষার বর্ণনাভঙ্গীর প্রতি কোন লক্ষ্য করেন নি। ফলে কোরআনের প্রতিটি শব্দ উর্দূ ভাষায় চলে এসেছে। কিন্তু হযরত শাহ্ আবদুল কাদের শাব্দিক অনুবাদের সাথে সাথে পরিভাষার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছেন।

এ অনুবাদকর্ম সম্পাদন করতে শাহ্ আবদুল কাদেরকে দীর্ঘ চল্লিশ বছরকাল একাধারে মসজিদে এ'তেকাফের জীবন-যাপন করতে হয়। মসজিদেই তিনি ইনতিকাল করেন এবং মসজিদের চত্বর থেকেই এ মহাসাধকের মরদেহ কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। দারুল-উলুম দেওবন্দ মাদরাসার প্রথম মোহতামেম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব-এর মন্তব্য, "নিঃসন্দেহে এ তরজমা এলহামের সাহায্যে সম্পাদন করা হয়েছে। অন্যথায় কোন মানুষের পক্ষে এমন নিখুঁত অনুবাদ কর্ম সম্ভবই হতে পারে না।"

শায়খুল-হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র) তাঁর যমানায় যখন অনুভব করলেন যে, উর্দূ পরিভাষার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলে হযরত শাহ্

আবদুল কাদেরের অনুবাদ সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে দুর্বোধ্য হয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি নতুন করে আধুনিক পরিভাষার আলোকে তরজমা করেছেন। সে তরজমাই শায়খুল-হিন্দ-এর তরজমা নামে খ্যাত হয়েছে। আমি আয়াতের অনুবাদ ক্ষেত্রে হযরত শায়খুল-হিন্দের সে তরজমাই অনুসরণ করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হুবহু তুলে দিয়েছি।

দুই. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) 'তফসীরে বয়ানুল-কোর-আন' এমন এক চমৎকার পদ্ধতিতে লিখেছেন যে, আয়াতের তরজমা অংশে বন্ধনীর মধ্যেই সংক্ষিপ্ত তফসীরও বলে দেওয়া হয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত তফসীরটুকু এত সুন্দর ও উপকারী যে, হযরত মাওলানার জীবৎকালেই অনেকে সে তরজমা কোরআনে সংযুক্ত করে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন।

হযরত থানবী (র)-র বয়ানুল-কোরআনের একটা সহজ সংস্করণ তৈরী করাই যেহেতু আমার দীর্ঘ কালের লালিত স্বপ্ন, সেজন্য তরজমার পর 'তফসীরের সারসংক্ষেপ' নামে আমি হযরত থানবী (র)-র বিস্তারিত তরজমা অংশটুকুই উদ্ধৃত করেছি। নিজের তরফ থেকে আমি শুধু পরিভাষাগত জটিলতা কিছুটা সহজ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র। হযরত থানবী (র)-র 'খোলাসায়ে-তফসীর' প্রকৃতপক্ষে একাধারে যেমন তরজমার বিস্তারিত রূপ তেমন অপরদিকে তফসীরের সার-সংক্ষেপও বটে। সেদিকে লক্ষ্য করেই আমি তফসীরের প্রথম সে সারসংক্ষেপটুকু উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয় মনে করেছি। এর মধ্যে যেসব তত্ত্বকথা একটু কঠিন মনে হয়েছে সে অংশগুলো পরবর্তী 'আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ে' সহজ ভাষায় ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছি। যদি কেউ শুধু তফসীরের সারসংক্ষেপটুকুও মোটামুটিভাবে পড়ে নেন, তবে তার পক্ষে তফসীর সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা অর্জন করা সহজ হবে।

এরপর ফেকাহ্-সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করে কোরআন শরীফের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে সহজ ধারণা অর্জন করা যাতে সহজ হয়, তার চেষ্টা হয়েছে।

তিন. তৃতীয় কাজ হচ্ছে 'মা'আরেফ ও মাসায়েল'। প্রকৃতপক্ষে এটুকুও আমার নিজের না বলে পূর্ববর্তী সাধক আলেমগণের তফসীর থেকে মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ বলা যেতে পারে। আমি সহজ উর্দু ভাষায় যথাস্থানে হাওয়ালাসহ বক্তব্যগুলো পরি-বেশন করেছি মাত্র। এ ব্যাপারেও আমি যে কয়টি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছি, তা হচ্ছে—

(ক) আলেমগণের পক্ষে কোরআনের তফসীরের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, প্রতিটি শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ, ব্যাকরণগত দিক, অলংকারশাস্ত্রের বিচারে সংশ্লিষ্ট আয়াতের বিচার-ব্যাখ্যা, বিভিন্ন ক্বেরাআত প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। আয়াতের প্রকৃত অর্থ ও মর্মোদ্ধারের জন্য এ দিকটা ঠিকমত উদ্ধার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু সাধারণ পাঠক তো দূরের কথা, আজকাল অনেক আলেমের পক্ষেও এসব ব্যাপারে প্রকৃত ধারণা অর্জন করার

চেষ্টায় ব্রতী হওয়া বিরক্তিকর শ্রম বলে বিবেচিত হয়, বিশেষত সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে তো এসব ব্যাপারে জড়িত হওয়া কোরআন সম্পর্কিত জ্ঞান-অর্জন করার পক্ষে প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়ে যায়। ফলে তাঁদের মধ্যে এমন ধারণাও সৃষ্টি হয়ে যায় যে, কোরআন শরীফ যথার্থভাবে পাঠ করাটা সত্য সত্যই খুব কঠিন কাজ। অথচ কোরআনী শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ—এমন সম্পর্ক যদ্দ্বারা বস্তুজগতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। বস্তুজগতের আকর্ষণ যেন আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতে না পারে এবং বান্দার মধ্যে দুনিয়ার চাইতে আখেরাতের ফিকির বেশী প্রাধান্য লাভ করে। মানুষের মধ্যে এমন একটা চিন্তাধারা সৃষ্টি হয় যে, প্রতিটি কথায় ও কাজে সে এমন চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয় যে, আমার এ কথা বা কাজ দ্বারা আল্লাহ্ এবং রাসূলের মর্জির খেলাফ কোন পদক্ষেপ হচ্ছে কি না! এ শিক্ষাটুকু কোরআন এমন সহজ করে দিয়েছে যে, সামান্য লেখাপড়া জানা লোক মোটামুটি পড়ে নিয়ে এবং লেখাপড়া না জানা লোক অন্যের নিকট শুনেও তা অনুধাবন করতে পারে। এ সম্পর্কে কোরআনের ঘোষণা ঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝

অর্থাৎ এবং অতি অবশ্যই কোরআনকে আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতঃপর কেউ কি এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে?

তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআনে সাধারণ পাঠকগণের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখেই শব্দের ব্যাখ্যা, ব্যাকরণের জটিল বিশ্লেষণ প্রভৃতির অবতারণা করা হয়নি। শুধু তফসীরবিদ ইমামগণের বিচার-বিশ্লেষণ থেকে গ্রহণযোগ্য মতটুকুই উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রয়োজনের খাতিরে সে ধরনের বিশ্লেষণের অবতারণা করা হলেও জটিল আলোচনা বাদ দিয়ে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে সেটুকু পরিবেশন করা হয়েছে। একই কারণে এমন সব আলোচনা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয় বা সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে অনুধাবন করা কষ্টকর হতে পারে।

(খ) নির্ভরযোগ্য তফসীর গ্রন্থসমূহ থেকে এমন সব তথ্য ও আলোচনাই শুধু উদ্ধৃত করা হয়েছে, যেগুলো পাঠ করলে কোরআনের মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ্ ও রাসূল (সা)-এর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য বাড়ে, কোরআনের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, আমল করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

(গ) প্রত্যেক মুসলমানই এ ব্যাপারে দৃঢ় ঈমান রাখেন যে, কোরআন শরীফ বর্তমানে যেমন সকল মানুষের জন্য সঠিক পথ প্রদর্শনকারী আল্লাহ্‌র কিতাব, তেমনি এটি কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত দিনের সকল মানুষের জন্য নির্ভুল পথের একমাত্র দিশারী হিসাবে নাযিল হয়েছে। দুনিয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষের যত সমস্যা আসবে, সে সবেরও সঠিক সমাধান কোরআনের মধ্যে রয়েছে। তবে সে সমাধান বের করার ব্যাপারে শর্ত হচ্ছে যে, রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষার আলোকে কোরআন ব্যাখ্যা ও পাঠ করতে হবে। এ কারণেই প্রতি যুগের আলেমগণ যুগ-সমস্যার

আলোকে কোরআনের তফসীর রচনা করেছেন। তাঁদের যমানায় বিধর্মী পথভ্রষ্ট শ্রেণীর তরফ থেকে দ্বীনের ব্যাপারে যেসব বিভ্রান্তি ও অপব্যাখ্যার প্রয়াস হয়েছে, তাঁরা আল্লাহ্‌র কালাম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেসব বিভ্রান্তির সঠিক জবাব পেশ করেছেন। মধ্যযুগের তফসীর গ্রন্থগুলো সে একই কারণে মু'তাযেলা, জাহমিয়া, সাফওয়ানিয়্যাহ প্রমুখ ভ্রান্ত মতবাদীর যথার্থ জবাবে পরিপূর্ণ দেখা যায়।

পূর্ববর্তিগণের সেপথ অবলম্বন করেই আমিও আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে সৃষ্ট নতুন নতুন সমস্যা এবং এ যুগের ইহুদী-খৃস্টান প্রাচ্যবিদদের দ্বারা সৃষ্ট যেসব প্রশ্ন মুসলিমদের মনে নানা সংশয়-সন্দেহের সৃষ্টি করেছে, নতুন উত্থাপিত এসব প্রশ্নের জবাব দান করার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে আমি প্রথমে কোরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহ্‌র ইমামগণের বক্তব্য উত্থাপন করার চেষ্টা করেছি, সরাসরি জবাব পাওয়া না গেলেও কোন ইশারা বা নজীর রয়েছে কি না, তা খুঁজে দেখেছি। আল্লাহ্‌র শোকর যে, আমার সে অন্বেষণ ব্যর্থ হয়নি। সমসাময়িক ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে এসব ব্যাপারে মত বিনিময় করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেও ত্রুটি করিনি। অবিশ্বাসী বা সন্দেহবাদীদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান প্রসঙ্গে খেয়াল রাখা হয়েছে। যেন জবাব যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য হয়। তবে সমকালীন কিছু সংখ্যক চিন্তাবিদের ন্যায় অন্যের সন্দেহ ভঞ্জনের খাতিরে দ্বীনী-মাসায়েলের মধ্যে কোন প্রকার পরিবতন বা সে ধরনের কোন সামঞ্জস্য বিধানের অপচেষ্টাও কোথাও করা হয়নি। অবশ্য এসব কিছু আমি আমার জ্ঞান ও ধারণার মাধ্যমেই করতে চেষ্টা করেছি। যদি এতে কোন ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে তবে সেজন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। দোয়া করি, যেন আল্লাহ্ তা'আলা সন্দেহবাদীদের জন্য হেদায়েতের পথ খুলে দেন।

তফসীর লেখার ক্ষেত্রে উপরোক্ত পন্থাগুলো অবলম্বন করার ফলে এখন তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন যা দাঁড়াচ্ছে তা হলো ঃ

এক. এ তফসীরে আয়াতের তরজমা অংশে শায়খুল-হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসানের তরজমা, প্রকৃত প্রস্তাবে যা হযরত শাহ্ আবদুল কাদের-এর তরজমারই আধুনিক রূপ, সেটি হুবহু অনুসরণ করা হয়েছে।

পরবর্তী ব্যাখ্যামূলক তরজমা হযরত থানবী (র)-র বয়ানুল-কোরআন থেকে গৃহীত। এর দ্বারা মা'আরেফুল-কোরআনে দু'দুটি নির্ভরযোগ্য তরজমার সমাবেশ ঘটেছে।

দুই. তফসীরের সারসংক্ষেপ ঃ প্রকৃতপক্ষে যেটুকু হযরত থানবী (র)-কৃত তফসীর বয়ানুল-কোরআন থেকে গৃহীত, ওটুকু যদি পৃথকভাবে একত্র করা হয়, তবে সেটাও সহজ-সরলভাবে কোরআনের মানে-মতলব বুঝবার পক্ষে যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি। এ ব্যাপারে একবার আমাকে খ্যাতনামা মুহাদ্দেস হযরত মাওলানা বদরে আলম মিরেঠি মরহুম আল্লামা ফরীদ ওয়াজদীর একখানা সংক্ষিপ্ত তফসীর দেখিয়ে উর্দু ভাষায়ও এ ধরনের একখানা তফসীর প্রকাশ করার আরজু প্রকাশ করেছিলেন। আমার মনে হয়, তফসীরের সারসংক্ষেপ অংশটুকু মরহুম মাওলানা সাহেবের সে আরজু পূর্ণ করতে সহায়ক হবে।

তিন. 'মা'আরেফ ও মাসায়েল' অংশ (আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়) আমার সাধনার ফসল। আলহামদুলিল্লাহ্! এটুকুও আমি নিজে রচনা না করে পূর্ববর্তী অনুসরণীয় ইমাম মুহাদ্দেসগণের চিন্তাধারাকে সাজিয়ে পরিবেশন করেছি। আজকালকার লেখকগণ নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তাধারা পরিবেশন করে যেখানে গর্বিত, আমি সেখানে আল্লাহ্র শোক্র আদায় করছি যে, আমি পূর্বসূরিগণের চিন্তা-গবেষণার ফসলটুকু নিংড়ে সে সবের সারনির্যাসই এ তফসীরে পরিবেশন করতে সমর্থ হয়েছি। আমার নিজের কোন মত এতে প্রবেশ করাতে চেষ্টা করিনি।

আল্লাহ্র তওফীকের জন্য শোকর! আকায়ে-নামদার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম।[১]

বিনীত

মুহাম্মদ শফী

দারুল উলুম, করাচী

২৫ শা'বান ১৩৯২ হিঃ

---

১. হযরত মুফতী সাহেব (র) লিখিত ভূমিকাটির শেষাংশ কিছুটা সংক্ষেপ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকুর অনুবাদ করা হয়েছে।

—অনুবাদক

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

সূরা আল-ফাতিহা

এ সূরাটি মক্কী এবং এর আয়াত সংখ্যা সাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য ঃ সূরা আল্-ফাতিহা কোরআনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূরা। প্রথমত এ সূরা দ্বারাই পবিত্র কোরআন আরম্ভ হয়েছে এবং এ সূরা দিয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত নামায আরম্ভ হয়। অবতরণের দিক দিয়েও পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এটিই প্রথম নাযিল হয়। সূরা 'ইক্‌রা', 'মুয্‌যাম্মিল' ও সূরা 'মুদ্দাস্‌সিরে'র ক'টি আয়াত অবশ্য সূরা আল-ফাতিহার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এ সূরার অবতরণই সর্বপ্রথম। যে সকল সাহাবী (রা) সূরা আল-ফাতিহা সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের সে বক্তব্যের অর্থ বোধ হয় যে, পরিপূর্ণ সূরারূপে এর আগে আর কোন সূরা নাযিল হয়নি। এ জন্যই এই সূরার নাম 'ফাতিহাতুল-কিতাব' বা কোরআনের উপক্রমণিকা রাখা হয়েছে।

'সূরাতুল ফাতিহা' একদিক দিয়ে সমগ্র কোরআনের সার-সংক্ষেপ। এ সূরায় সমগ্র কোরআনের সারমর্ম সংক্ষিপ্তাকারে বলে দেওয়া হয়েছে। কোরআনের অবশিষ্ট সূরাগুলো প্রকারান্তরে সূরাতুল ফাতিহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা। কারণ, সমগ্র কোরআন প্রধানত ঈমান এবং নেক আমলের আলোচনাতেই কেন্দ্রীভূত। আর এ দু'টি মূলনীতিই এ সূরায় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীরে রূহুল মা'আনী ও রুহুল বয়ানে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তাই এ সূরাকে সহীহ হাদীসে 'উম্মুল কোরআন' 'উম্মুল কিতাব', 'কোরআনে আযীম' বলেও অভিহিত করা হয়েছে। (কুরতুবী)

অথবা এ জন্য যে, যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত বা অধ্যয়ন করবে তার জন্য এ মর্মে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সে যেন প্রথমে পূর্বপোষিত যাবতীয় ধ্যান-ধারণা অন্তর থেকে দূরীভূত করে একমাত্র সত্য ও সঠিক পথের সন্ধানের উদ্দেশ্যে এ কিতাব তেলাওয়াত আরম্ভ করে এবং আল্লাহ্‌র নিকট এ প্রার্থনাও করে যে, তিনি যেন তাকে সিরাতুল-মুস্তাকীমের হেদায়েত দান করেন।

এ সূরার প্রথমেই রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা। এর অর্থ হচ্ছে যে, এ প্রশংসার মাধ্যমে আল্লাহ্র দরবারে হেদায়েতের দরখাস্ত পেশ করা হলো। আর এ দরখাস্তের প্রত্যুত্তরই সমগ্র কোরআন, যা الٓمٓ ذٰلِكَ الْكِتَابُ দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষ আল্লাহ্র নিকট সঠিক পথের যে সন্ধান চেয়েছে, আল্লাহ্ পাক তার প্রত্যুত্তরে الٓمٓ ذٰلِكَ الْكِتَابُ বলে ইশারা করে দিলেন যে, হে আদম সন্তানগণ, তোমরা যা চাও তা এ গ্রন্থেই রয়েছে।

হযরত রাসূলে করীম (সা) এরশাদ করেছেন যে,—যার হাতে আমার জীবন-মরণ, আমি তাঁর শপথ করে বলছি, সূরা আল-ফাতিহার দৃষ্টান্ত তওরাত, ইনজীল, যবুর প্রভৃতি অন্য কোন আসমানী কিতাবে তো নেই-ই, এমনকি পবিত্র কোরআনেও এর দ্বিতীয় নেই। ইমাম তিরমিযী আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন যে,—সূরায়ে-ফাতিহা প্রত্যেক রোগের ঔষধবিশেষ।

হাদীস শরীফে সূরা আল-ফাতিহাকে সূরায়ে শেফাও বলা হয়েছে। (কুরতুবী)

বোখারী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন,—সমগ্র কোরআনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সূরা হচ্ছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ—(কুরতুবী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

بِسْمِ اللّٰهِ কোরআনের একটি আয়াত ঃ সমস্ত মুসলমান এতে একমত যে, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কোরআন শরীফের সূরা নাম্‌লের একটি আয়াত বা অংশ এবং এ ব্যাপারেও একমত যে, সূরা তওবা ব্যতীত প্রত্যেক সূরার প্রথমে ... بِسْمِ اللّٰهِ... লেখা হয়। بِسْمِ اللّٰهِ সূরা আল-ফাতিহার অংশ না অন্যান্য সকল সূরারই অংশ, এতে ইমামগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন بِسْمِ اللّٰهِ সূরা নাম্‌ল ব্যতীত অন্য কোন সূরার